স্বস্তিকা

দাম ঃ ছয় টাকা

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা - ৮ নভেম্বর, ২০১০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❖

দেবীপ্রসঙ্গ

শতরূপে দেখি যে তোমায় ❖ সংকর্ষণ মাইতি

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ❖ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী
রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ❖ ডঃ প্রীতিমাধব রায়
পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন ❖ বাসুদেব পাল
করসেবকের ডায়েরী ❖ নবকুমার ভট্টাচার্য
একবার বিদায় দে মা ❖ অর্ণব নাগ

শ্রীরামচন্দ্র এক ঐতিহাসিক ও ন্যায়ালয় স্বীকৃত সত্ত্বা
❖ ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া

অযোধ্যার রামমন্দির অভিনব ঐতিহাসিক রায় ❖
ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী
অযোধ্যার রায় ও তার প্রতিক্রিয়া ❖
ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। দাম ৬ টাকা।।

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS
RNP-048/LPWP-028/2010-12
● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫,
টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

স্বস্তিকা
দীপাবলী সংখ্যা
৬৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১২
৮ নভেম্বর , ২০১০

সম্পাদকীয়

রামজন্মভূমি আন্দোলন

বিশ্বের অনেক দেশই বিদেশী আক্রমণের ফলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জাতীয় চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বীর সন্তানরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও এই রাষ্ট্রচেতনা জাগ্রত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিদেশী আক্রমণকারীরা সোমনাথ ও অযোধ্যার মতো শ্রদ্ধা কেন্দ্রগুলি বারংবার ধ্বংস করিয়াছে। হিন্দুসমাজ প্রতি ইঞ্চি জমিতে নিজস্ব পরম্পরা বজায় রাখিবার জন্য সংঘর্ষ করিয়া শ্রদ্ধা কেন্দ্রগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ধ্বংস ও নির্মাণের এই দীর্ঘ ইতিহাস ভারতীয় সংস্কৃতির বিজিগীষু মনোভাব ও অমরত্বের অনন্ত প্রেরণাদায়ী রোমাঞ্চ কারী গৌরবগাথা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের বিভীষিকার মধ্যে স্বাধীনতার পদধ্বনি যখন শোনা যাইতেছিল তখন ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত হইয়া সোমনাথ বা অযোধ্যার মতো শ্রদ্ধা কেন্দ্রগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য জাতি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উৎখনন কার্য এবং অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে তথাকথিত বাবরি ধাঁচার ভিতরে ভগবান রামলালার মূর্তির আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে হইয়াছিল। প্রবল জনসমর্থনের কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রামলালার মূর্তি অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রচেতনার এই পতাকা বহন করিবার নেতৃত্বের ভার পূজ্য সাধুসন্ত ও সজ্জন শক্তির উপর আসিয়া পড়ে। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের বন্ধ তালা খুলিবার শপথ তাঁহারা লইয়াছিলেন, শপথ সফল হইয়াছিল, তালা খুলিয়া গিয়াছিল। মন্দিরের শিলান্যাসের জন্য সমাজকে সংকল্পবদ্ধ করাইলেন, শিলান্যাস হইয়া গেল। করসেবার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করাইলেন, তাহা প্রতিহত করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। সমাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু বুঝিয়া উঠিবার আগেই বিদেশী কলঙ্কটিও ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সাম্প্রতিক আদালতের রায়ে রামজন্মভূমিতে পুনরায় সুরম্য মন্দির নির্মাণের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এবং তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যার প্রতি ভারতীয় জনমানসের সনাতন আস্থার সসম্মান স্বীকৃতি হইল এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে র ৩০ সেপ্টেম্বরের এই রায়। স্বাধীনোত্তর ভারতে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন সর্বকালের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ও দীর্ঘকালীন আন্দোলন। বস্তুত এই আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলন-ই নয়, বরং এর গতিপ্রকৃতি বহুমুখী এবং তাঁর প্রভাব সর্বস্পর্শী। এই আন্দোলনের প্রভাব আমরা জাতীয় জীবনের বহুক্ষেত্রে—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইন ও তৎসহ বিচারবিভাগীয়সহ নানা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকি। সারা দেশের মানুষই এই আন্দোলন সম্পর্কে শুধু সচেতন-ই নয়, কমবেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছে।

রামজন্মভূমি আন্দোলন এদেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বিজেপি নেতা শ্রী আদবানীর সোমনাথ হইতে অযোধ্যা রাম-রথযাত্রা এবং ইহার পরিণতিতে ভি পি সিং সরকারের পতন হইয়াছিল। করসেবকদের উপর নির্মম অত্যাচারের কারণে উত্তরপ্রদেশে ১৯৯১-এর এপ্রিলে মুলায়ম সিং সরকারের পতন হয়। আর ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২-তে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে ধাঁচা ধুলিসাৎ হওয়ায় বিজেপি শাসিত চারটি রাজ্য-সরকারকে বলির পাঁঠা করা হইয়াছিল। কোনও রাজনৈতিক দলই এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যেক দল নিজেদের অবস্থান জানাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম, মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কখনও বা উন্নয়ণের ধুয়া তুলিয়া রামজন্মভূমি মন্দির অন্যত্র নির্মাণের বা ওই স্থানে কোনও জনকল্যাণমূলক কেন্দ্র কিংবা মন্দির মসজিদ দুই-ই নির্মাণের ওকালতি করিয়াছে। জন্মস্থান যে পরিবর্তন করা যায় না তাহা বুঝিয়াও ইহারা জাগিয়া ঘুমায়। রায় বাহির হইবার আগে যাহারা সংবিধান সম্মতভাবে বা আদালতের নির্দেশ মতো মীমাংসার কথা বলিতেন, এখন তাহারা পাল্টি খাইয়া বলিতেছেন, আদালত এ এস আই-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে নয়—বিশ্বাস বা আস্থার ভিত্তিতে রায় দিয়াছেন। যদিও আদালত এ এস আই-এর রিপোর্টের কথাই বলিয়াছেন। তবে একথাও স্পষ্ট হওয়া দরকার—ঈশ্বর বা সত্য-র প্রতি বিশ্বাস সংবিধান সম্মত। আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিরা ঈশ্বর বা সত্যর নামে শপথ গ্রহণ করিয়াই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম এই আস্থার প্রতীক। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। আমাদের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তার পরিচয়। তাঁর জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণ আন্দোলন এই দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনাকে বিপুলভাবে জাগ্রত করিয়াছে। সমগ্র জাতি একসঙ্গে সোচ্চার হইয়াছে। তাই শুধু একটি মন্দির নির্মাণ নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি আরও একবার এই আন্দোলনের মাধ্যমে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শতরূপে দেখি যে তোমায়

সংকর্ষন মাইতি

ছোটবেলায় কালী মায়ের নামে একটি ছড়া লোকমুখে শুনতাম। সেটি এইরকম।

'ওরে কালী তোরে বলি দক্ষরাজার ঝি
স্বামীর বুকে পা'টি রেখে হচ্ছেটা কী?'

স্বামী বলতে এখানে শুভ্র-কায়া শিব। কালীমা যেখানেই পূজিতা হোন না কেন, কালী প্রতিমার পায়ের নীচে অবশ্যই শিব আছেন। দেখা যাচ্ছে, দুর্গা-সতী-কালী—তিন দেবীর স্বামী শিব, আসলে তিন দেবীই তো একজন। আদ্যাশক্তি মহামায়া। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তিনি আবির্ভূতা, দশমহাবিদ্যার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হলেন কালী।

কালীই বাঙালির চিন্তা-চেতনে। কালীঘাটের কালী, রামপ্রসাদের কালী, বামাক্ষ্যাপার কালী (তারামা রূপে), রামকৃষ্ণের কালী, ডাকাতদের বরাভয় রূপে শ্মশানকালী, ভয়ঙ্কর-দর্শন কাপালিকের কালী—সবার কালী। বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ—তিন সাধক ভক্তিরস দিয়ে কালীকে আপন মা এবং জগজ্জননীর স্থানে বসিয়েছেন। এবং সার্থক-সাধনাটিকে বাঙালিদের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দিয়েছেন (বলা যেতে পারে বিশ্বাসটাকে উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছেন, যা টোল খায়নি) যে বাঙালিরা আপ্লুত না হয়ে থাকতে পারেননি। তাই তো দেখা যায়, প্রবাসী বাঙালিরা প্রবাসে থাকাকালীন অন্ততঃ একটি কালীমন্দির তৈরি করে কালী মায়ের নিত্য পুজোর ব্যবস্থা করেছেন। কালী যেন বাঙালিদেরই। শুধু হিন্দু বাঙালির না, মুসলমান বাঙালিদেরও, নজরুল ইসলাম কালী-পুজো করতেন। তাঁর ছোট ছেলে কাজি অনিরুদ্ধ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কালীমাকে পুজো দিতেন। শুধু বাঙালি মুসলমান কেন অবাঙালি মুসলমানও দুর্গা ও কালীর পুজো করেন।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা দুর্গাপুজোয় অংশ নেন, অনেকে আবার উদ্যোক্তা, ৩৬ বছর ধরে দুর্গা মায়ের মন্ত্র পড়ে পুজো করে আসছেন ওড়িশা রাজ্যের খোড়ার্দ্ধা জেলার বোলগড় ব্লকের মানিকগোড়া গ্রামের শেখ হবিবুর রহমান। 'অপরাজিতা' হোম অনুষ্ঠানে হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতিও দেন তিনি। পঞ্চ দশ শতাব্দীতে গজপতি যুবরাজের কাছ থেকে একটি তলোয়ার উপহার হিসেবে পেয়ে দেহরক্ষী গোলাম আলি দুর্গাপুজোতে তলোয়ার পুজোর ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে মানিকগোড়া গ্রামে 'দলবেহেরা' মুসলমান পরিবার পুজো করে আসছেন।

কালী-কালী-কালী—কালী মায়ের মতো চার যুগ ধরে এমন কোনও দেবী (যদিও দুর্গা স্বয়ং কালী) ভক্তজনের হৃদয়ে রেখাপাত করতে পারেননি। সত্যযুগে, চণ্ড ও মুণ্ড বধে আবির্ভূতা কালী। দুই অসুরকে নিহত করে তাঁর তাথৈ তাথৈ নৃত্য। সেই নৃত্য থামাতে দেবকুল ব্যর্থ। অবশেষে স্বামী শিব মাটিতে শুয়ে পড়ে নৃত্য থামান। ত্রেতাযুগে, মহীরাবণের কালীপুজো। রাম লক্ষ্মণকে বলি দেওয়ার আয়োজন। হনুমানের কারসাজিতে কালী মায়ের সামনেই মহীরাবণকে বধ হতে হলো। সীতা মাও কম যান না। তাঁকে কালীরূপ ধরতে হয়েছিল শতস্কন্ধ (অন্যমতে সহস্রস্কন্ধ) রাবণকে বধ করার জন্য।

যুদ্ধে শতস্কন্ধ রাবণ রামলক্ষ্মণকে পরাস্ত করেন। মায়াবলে, রামলক্ষ্মণ বন্দীবস্থায় মূর্চ্ছা যান। হনুমানের কাছে দুঃসংবাদটি পেয়ে সীতাদেবী নিজে কালীরূপ ধারণ করেন ক্রুদ্ধ হয়ে শতস্কন্ধ রাবণ যেখানে কালীর আরাধনায়, সেখানে জয়ঘণ্টা কেটে দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে আহ্বান করে শতস্কন্ধ রাবণকে হত্যা করেন। রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করলেন। আরও আছে, স্বয়ং রাবণ ছিলেন শক্তির পূজারি। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হঠাৎ হনুমানের মুষ্টাঘাতে রাবণ অচৈতন্য, চেতনা ফিরতেই তিনি মা দুর্গার স্তব করেন। মা দুর্গা তখন দক্ষিণায়নে ঘুমিয়ে আছেন। রাবণের স্তবে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ। ভক্তের আহ্বানে সাড়া দেন। মহাকালী রূপে রাবণকে কোলে তুলে নেন। দৃশ্যটি দেখে রামচন্দ্র অবাক, কৃপালাভের জন্য তিনিও ধনুর্বাণ ছেড়ে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দুই ভক্তের মাঝখানে দেবী।... দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের তো বহু লীলা খেলা, রাধারাণী কলঙ্ককে ভয় করেন। তবু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। জুটিলা, কুটিলা মায় স্বামীর কাছে ধরা পড়ে যেতে যেতে উদ্ধার হয়ে গেলেন কৃষ্ণের ছল-চাতুরিতে। কৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করে কলঙ্ক থেকে রাধারাণীকে মুক্ত করে দিলেন।...কলিযুগে— এই তো পাঁচশো বছর আগে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কালীর কোলে গোপালকে (কৃষ্ণকে) কলা খেতে দেখলেন। আর মাত্র দেড়শো বছর আগে এক বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে কালীরূপে দেখলেন। প্রত্যয় হলো রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং কালী। সারদামণি বিলক্ষণ জানতেন স্বামী স্বয়ং কালী। আর সারদাদেবী? তেলেভেলোর মাঠে ডাকাতদের নিজের স্বরূপটা কী দেখিয়েছিলেন? সেও তো কালী, তাহলে? দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে কালী। এবং তিনি সর্বব্যাপী। উৎসটি কোথায়? ফিরে যেতে হবে পৌরাণিক যুগে।

কালীর জন্ম নিয়ে বিভিন্নমত। গিরিরাজের স্ত্রী মা মেনকার গর্ভে নীলোৎপলদল শ্যামা রূপেই নাকি কালীর জন্ম। অন্যমতে— আদ্যাশক্তি মহামায়ার (দেবী দুর্গা) সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ কালে মহামায়ার ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি থেকে কালীর জন্ম। অসুর বধের জন্য কালীর জন্ম।

কালিকাপুরাণে আছে—হিমালয়ে অবস্থিত মতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়ে দেবতারা মহামায়ার স্তব করেন। মতঙ্গের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে মহামায়া দেবতাদের দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন— 'তোমরা কার স্তব করছো?' সেই সময় দেবীর শরীর থেকে কালো পাহাড়ের মতো বর্ণযুক্তা আরো এক দিব্য নারী প্রকট হন। সেই নারী দেবতাদের হয়ে উত্তর দেন—'এরা আমার স্তব করছে।' উত্তরদাতা নারী কৃষ্ণবর্ণা বলে নাম কালী।

(দশমহাবিদ্যা/গীতাপ্রেস/গোরক্ষপুর)

শ্রীশ্রী চণ্ডী অনুসারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হয়ে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে 'দেবীসূক্ত' দিয়ে গৌরীর বন্দনা করেন। তখন গৌরীর দেহ থেকে কৌশিকী আবির্ভূতা হন। কৌশিকী গৌরীর দেহ থেকে আলাদা হওয়া মাত্র অম্বা পার্বতীর স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যায়। তখন তিনি কালী নামে বিখ্যাত হন। আবার কালী নীলবর্ণা হওয়ায় তিনি 'তারা' নামেও পরিচিতা হন।

(দশমহাবিদ্যা/গীতাপ্রেস/গোরক্ষপুর)

আর একটি মত প্রচলিত। মহামায়া 'সতী' দক্ষরাজার ছোট মেয়ে হিসেবে জন্ম নেন। অনেক পাত্র খোঁজার পর বিয়ে হলো তাঁর শিবের সঙ্গে। একবার রাজা দক্ষরাজ যজ্ঞ করেছিলেন। মেয়ে জামাই আমন্ত্রিত। শিব সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে শ্বশুর দক্ষরাজকে প্রণাম জানাননি। এতে দক্ষরাজের দারুণ অভিমানসহ রাগ ছিল জামাই-এর ওপর। দ্বিতীয়বারের যজ্ঞে তিনি মেয়ে জামাই কাউকে আমন্ত্রণ জানাননি। নারদের মুখ থেকে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা জানতে পেরে বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য সতীর মন ব্যাকুলিত। সতীর ইচ্ছে, বাবার বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলবেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে জামাইকে আহ্বান করো বাবা। সতী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন শিবের কাছে। বাবার বাড়ি যেতে অনুমতি দিতে হবে। শিব বাধা দিলেন। বললেন 'সতী বাবার বাড়ি যেও না। উপযাচক হয়ে গেলে তোমার তো সম্মান থাকবে না, পরন্তু বাবার কাছে গালমন্দ খেতে হবে,—যা তুমি সইতে পারবে না। কী দরকার যাওয়ার?'

সতীর গোঁ—বাবার বাড়ি যাবেন। শিব বারে বারে বাধা দেন। এতে সতীর বেশ অভিমান হয়—অভিমান থেকে রাগ। রাগের বশে সতী ভয়ঙ্কর কালীরূপ পরিগ্রহ করলেন। কালীর পাশে আরও নয়টি নারী মূর্তি—যা দশমহাবিদ্যা (কালীসহ) নামে পরিচিত। শিব দেখলেন—এ যে দশদিকে দশমহাবিদ্যা! বিশেষত কালীর ভয়ঙ্কর রূপে ভীত হলেন তিনি।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধি বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

কালীর রূপ দেখে শিব ভয় পেয়ে ছিলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলেন সতী তো যে সে নারী নয়। সতী দশমহাবিদ্যার প্রকাশ ঘটিয়ে চোখ খুলে দিলে। আর দেরি না করে সতীকে বাবার বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পরের ঘটনা আরও আছে—সে প্রসঙ্গ থাক।

কালী— 'কালী করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাম্' বিবসনা মুক্তকেশী-শিবের বুকে ও জানুর ওপর নিজের পা জোড়া রেখে দণ্ডায়মান কালীর ভয়ঙ্কর রূপটি আমরা দেখি। দেবীর গায়ের রঙ কাজল কালো। চার হাত, ত্রিনয়নী, বামদিকে দু'হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ড, নরমুণ্ডের ঠিক নীচে ওপরের দিকে হাঁ-করা শেয়ালের প্রতিমূর্তি। ডান হাত দুটি বরাভয়ের। গলায় ৫০টি মুণ্ড নিয়ে মুণ্ডমালা, দেবীর মুখ-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আছে লাল টকটকে জিভ। মোটামুটি কালী মায়ের একটা ছবি আমাদের সামনে। মায়ের মূর্তি বর্ণিত হলো। বর্ণিত মূর্তির অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পেতে পারি।

কালী মায়ের কালো রঙ

সব রঙ মিলে হয় কালো রঙ। অজ্ঞানতার রঙও কালো। যিনি

মনে অজ্ঞতা, হিংসা, দ্বেষ, শঠতা প্রবঞ্চনা, কাম্য লোভ এবং কালিমাকে (কলঙ্ককে) গ্রাস করে নেন তিনিই কালী। গায়ের রঙও তাই কালো বর্ণ মায়ের।

চার হাত—

চারটি হাত চারটি দিক নির্ণয় করছে। চারদিকেই তিনি আছেন।

ত্রি নয়ন—

সাধারণতঃ জীবজন্তু, মানুষ ও দেবদেবীর দুটি করে চোখ আছে। ইন্দ্রের আবার মুখমণ্ডলসহ সারা গায়ে শত শত চোখ। কোনও কোনও দেব দেবীর আবার তিনটি করে চোখ বা নয়ন। শিব-দুর্গা-কালী সহ অনেক দেবদেবীর তিনটি নয়ন। তিনটি নয়নের নাম চন্দ্র-সূর্য-হুতাশন। 'ইদং নেত্র ত্রয়ং দিব্যং চন্দ্র-সূর্য্য-অনল প্রভং'। অনল অর্থে হুতাশন।...

তৃতীয় নয়নটি হলো জ্ঞানচক্ষু। মানুষের কি তৃতীয় নয়ন আছে? আছে, অদৃশ্যভাবে, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিন্তক ও গবেষকদের তৃতীয় নয়ন রয়েছে। তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু দিয়ে অন্তর্জগৎ ও ভবিষ্যৎ দেখা।

উলঙ্গিনী

আমাদের চার পাশ এবং মাথার ওপর আকাশ ফাঁকা। আকাশ তো শূন্য—যেন উলঙ্গ। দেবীর সব দিকে আকাশ। আকাশের আর এক অর্থ অম্বর। দেবীকে দিগম্বরী নামে অভিহিত করা হয়েছে ফাঁকা অর্থাৎ উলঙ্গ আকাশের জন্য। এখানে উলঙ্গের প্রতিরূপ তিনি অর্থাৎ কালী।

গলায় মুণ্ড মালা

গলায় মুণ্ডমালা। ৫০টি নরের মুণ্ড নিয়ে মুণ্ডমালা গলা থেকে সামনে কোমর ছড়িয়ে ঝুলছে। ৫০টি মুণ্ড হলো জ্ঞানশক্তির আধার। অন্যমতে মুণ্ডমালাটি হলো ৫০টি বর্ণমালার প্রতীক।

হাতে খড়্গ ও অসুরের কাটা মুণ্ড

অসুরদের সঙ্গে যখন দেবী চণ্ডিকা কিংবা চামুণ্ডার (কালীর) যুদ্ধ হয়েছে তখন অসুরগণ কখনো শূলে বিদ্ধ হয়ে অথবা খড়্গাঘাতে মারা গেছে। দেবীর বামহাতে খড়্গ ধারণ—তার মানে মানুষের মধ্যে কাম-ক্রোধ-শঠতা এবং অসুর-প্রবৃত্তিকে ধবংস করতে খড়্গ ধারণ।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী অংশের অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজ অসুরের কথা উল্লেখ আছে। রক্তবীজের এক বিন্দু রক্ত যদি মাটিতে পড়ে তাহলে শত শত হাজার হাজার অসুরের জন্ম হবে ওই রক্তবিন্দু থেকে। দেবী চণ্ডিকার সঙ্গে যুদ্ধের সময় রক্তবীজের রক্ত থেকে বহু অসুরের জন্ম হয়েছে। দেবী চণ্ডিকা চামুণ্ডাকে নির্দেশ দেন, মাটিতে পড়ার আগে ওই রক্ত পান করতে। শুধু মাটি না, যে কোনও জায়গায় মায় জিভে পড়লেও অসুরের জন্ম হবে। চামুণ্ডা বিশাল মূর্তি ধারণ করে লম্বা জিভ্ মেলে দিয়ে রক্তবীজের রক্ত পান করেন। অবশেষে রক্তবীজ নিহত।...

কালী প্রতিমার হাতে কাটামুণ্ড ও মুণ্ডের নীচে শেয়ালের অবস্থান —মুণ্ড থেকে ঝরে-পড়া-রক্ত শেয়ালের খাওয়া—এটা আর কিছু না, মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভ, ভোগ-পিপাসা আর যাতে না বাড়ে তার একটা রূপ দেওয়া।

লোল জিহ্বা

মানুষের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, গর্হিত কাজকর্ম, অহঙ্কার, শোষণ, বঞ্চনা দেখেই কালী মা লজ্জায় জিভ কেটেছেন। ধিক্কার জানিয়েছেন এভাবে। এখন তো অনেকে কারো লজ্জাজনক গর্হিত কাজকে সমর্থন না করে ধিক্কার জানান নিজের জিভ্ কেটে। গর্হিত কাজ করে লজ্জায় আমরা জিভ্ কাটি, তার মানে অন্যায়টা স্বীকার করা। শিবের বুকে পা দিয়ে কালী মা অন্যায়টা বুঝেছেন, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবনত হয়ে জিভ্ কেটেছেন,

পাড়ার মধ্যস্থিত স্থানে গোয়ালাদের বাড়ির কাছে এসে দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হলো এক গোপরমণীর দিকে। দেখেন কালো রঙের গৃহবধূটি ডান পা গোয়াল ঘরের দেওয়ালে তুলে ডান হাত দিয়ে দেওয়ালে গোবর নিক্ষেপ করে ঘুঁটে তৈরিতে ব্যস্ত। আলুলায়িত কেশ, মাথা থেকে ঘাম ঝরে কপালের সিঁদুর তরল হয়ে ভ্রূযুগলকে লাল রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণানন্দকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি লজ্জায় দাঁতে জিভ্ কাটলেন। কৃষ্ণানন্দ খুব খুশি হয়ে মনে মনে বলে ফেললেন – 'পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি....'।

আমাদের জ্ঞানের জন্য তাঁর জিভ্ কাটা।

শিবের বুকে পা

কালীমায়ের পায়ের নীচে শিবের শায়িত অবস্থান। শিব শব হয়ে পড়ে ছিলেন কালীমায়ের নৃত্য থামাতে। কেউ বলেন, শিব হলেন শব-শিবা। এই শব-শিবার গায়ে পা তুলে কালীমা লজ্জায় জিভ্ কেটেছেন। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর উলঙ্গ-নৃত্য। এই নৃত্য থেমেছে শিবের বুকে পা'টা পড়তেই। শিব যে স্বামী—কী লজ্জা! কী লজ্জা! লজ্জায় তাঁর জিভ কাটা।

শিব হলেন চেতনার প্রতিমূর্তি। গায়ের রঙও সাদা। তার মানে নির্মল, স্বচ্ছ। এই শুভ-স্বচ্ছতার স্পর্শে লজ্জা গ্লানি দূরীভূত হওয়া। চেতনার স্পর্শে মানুষ সংযমী হোন—সুকুমার বৃত্তি ফিরে ফিরে আসুক—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর ভাবনা চিন্তা করুন।

আগে কার্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামা পুজো হতো তা 'ঘটে' সীমাবদ্ধ ছিল। কোনও মূর্তি ছিল না। কৃষ্ণানন্দ আমগবাগীশ মূর্তির কথা ভাবলেন, মূর্তি নাহলে পুজো পূর্ণতা পায় না। মনটাও ভরে না। মূর্তি করে কালিকা অর্থাৎ কালীর পুজো করার মনস্থ করলেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে বরাভয় কর কীরূপে গর্বিত হবে এবং ভ্রূযুগল কী রঙে রঞ্জিত হবে তা নিয়ে খুব চিন্তিত হলেন। রাতে স্বপ্নাদেশ দেবীর—

'কাল বিছানা থেকে উঠে সকালে যে মূর্তি দেখতে পাবে, তাতেই আমার বরাভয় কর ও ভ্রূযুগলের কথা জানতে পারবে।'

পরের দিন সকালে বিছানা ছেড়ে কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি নিয়ে পাড়ার মধ্যে কৃষ্ণানন্দ ভ্রমণ করছেন। পাড়ার মধ্যস্থিত স্থানে গোয়ালাদের বাড়ির কাছে এসে দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হলো এক গোপরমণীর দিকে। দেখেন কালো রঙের গৃহ-বধূটি ডান পা গোয়াল ঘরের দেওয়ালে তুলে ডান হাত দিয়ে দেওয়ালে গোবর নিক্ষেপ করে ঘুঁটে তৈরিতে ব্যস্ত। আলুলায়িত কেশ, মাথা থেকে ঘাম ঝরে কপালের সিঁদুর তরল হয়ে ভ্রূযুগলকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণানন্দকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি লজ্জায় দাঁতে জিভ্ কাটলেন। কৃষ্ণানন্দ খুব খুশি হয়ে মনে মনে বলে ফেললেন—'পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি'...।

বাড়ি ফিরে মূর্তির অবয়ব ঠিক করে ফেললেন। রাত্রে কাদা দিয়ে কালিকা মূর্তি তৈরি করে ফেললেন। মূর্তিতে আকাশী রঙ চড়ালেন। আকাশী রঙ মোটামুটি শ্যাম বর্ণের। কালিকা দেবী 'শ্যামাকালী' রূপে পরিগণিতা হলেন। পুজোর পদ্ধতি নিজেই ঠিক করে ফেললেন। তাঁর এই পুজোয় কোনো বলিদান বা মাদকতার স্পর্শ নেই। তাঁর পুজোর পর থেকে কার্তিকী অমাবস্যায় 'শ্যামা পুজো'র প্রবর্তন হয়। তাঁর প্রবর্তিত শ্যামাকালী পুজো 'শ্যামা পুজো' হিসেবে চালু রয়েছে—যা পাঁচশো বছর আগে মূর্তিটি প্রকাশিত, শ্যামাপুজো মানেই শ্যামা কালীর পুজো, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' ও শ্রীতত্ত্ব বোধিনী নামে দু'খানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতের শক্তিসাধনা বহু দিনের। হাজার হাজার বছর আগের। মূলতঃ প্রকৃতির রুদ্ররোষের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তৎকালীন মুনিঋষিরা প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে চেয়েছেন। যজ্ঞ, পূজার্চনা ও বলিদানের মাধ্যমে। এখনও তো কোনও কোনও সম্প্রদায় প্রকৃতিদেবীকে তুষ্ট করতে পুজাপার্বনের সঙ্গে পশুবলি দিয়ে থাকেন। এতো গেল অরণ্যবাসী বা আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু আধুনিক সুস্থ সংস্কৃতি চেতন, বিজ্ঞানমনস্ক নগরবাসীরা দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দিয়ে চলেছেন। অথচ বলি দেওয়ার কথা ষড়রিপুকে, রিপুর পরিবর্তে পশু বলি! ভীতি, কুসংস্কার, অজ্ঞতা—এসব কাটিয়ে উঠতে পারলো না মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতেও। পাঁচশো বছর আগে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অজ্ঞতা কুসংস্কার এড়িয়ে যেতে পারলেন, আমরা কিন্তু পারলাম না। এটা লজ্জার। লজ্জায় জিভ্ কাটা তো স্বাভাবিক।...

কার্তিকী অমাবস্যার দিনে আর একটি উৎসব—আলোর উৎসব দীপাবলি। অন্ধকার রাতে বাড়িতে বাড়িতে দীপাবলির উৎসব কাহিনি আছে।

রামচন্দ্র বারণকে বধ করে লঙ্কা থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেন। চৌদ্দ বছর বনবাস কাটিয়ে রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে ছিলেন কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে। অযোধ্যায় ফিরতেই রাজপ্রসাদে দীপাবলি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের উজ্জ্বল স্মৃতি স্মরণ করে উত্তরপূর্ব ভারতে দীপাবলি উৎসব পালিত হচ্ছে।...দীপাবলি উৎসবের প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকটাও বয়েছে। আলো জ্বালালে (প্রদীপ ও মোমবাতির আলো) আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মশা পোকাগুলি মারা পড়ে। এতে মশা, পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশ কমে।

পরিশেষে—শ্যামা পুজো ও দীপাবলি উৎসব মিলেমিশে একাকার। কাজল কালো অন্ধকার, শ্যামা পুজো, দীপাবলি উৎসব—সমগ্র ব্যাপারটি ব্যঞ্জনাময়—বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে 'ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়ঃ, তমোসো মা জ্যোতির্গময়ঃ' শ্লোকটির মধ্য দিয়ে। মোদ্দা কথা—'অজ্ঞতা' থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের আলোয় প্রবেশ করা।

তথ্য সহায়তা

শ্রীশ্রী চণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত/ উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা/সপ্তদশ সংস্করণ-১৯৮৫। দশমহাবিদ্যা—গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর/ষষ্ঠ সংস্করণ-২০০৮ নবদ্বীপ মহিমা—কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী/সম্পাদনায়—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ-১২৯১/পরিবর্ধিত সংস্করণ-১৪১১ সাল (ইং-২০০৪)/নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ। কালীর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা—শুভা প্রসন্ন। মাকালী—দূর্বা বাগচী/বর্তমান-১০/১০/২০০৯। কোন কালী কেমন, কার পুজোয় কী ফল—সঞ্জয় ভুঁইয়া/বর্তমান-১১/১০/২০০৯। দুর্গাপুজোর হোম করেন মুসলমান—দেবব্রত দাস/বর্তমান-২০/৯/২০০৯

বাবার গিটার কথা বলত (দাদু নজরুলের কালী পুজোর প্রসঙ্গ)—অনিন্দিতা কাজী/বর্তমান-১৮/৯/২০০৯

মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

তমসা নদীর তীরে আশ্রমে বসে আছেন তপঃসিদ্ধ মুনি বাল্মীকি। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন বীণাহস্তে হরিগুণগানে মগ্ন দেবর্ষি নারদ। বেদজ্ঞ, তপস্বী নারদকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন শ্রদ্ধাভরে, 'দেবর্ষি! সম্প্রতি পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত। কাকে রণস্থলে দেখলে দেবতারাও ভয় পান'। বাল্মীকির প্রশ্ন শুনে ত্রিকালজ্ঞ নারদ বললেন, 'তুমি যে বহুগুণের কথা বললে একাধারে তার মিলন দুর্লভ। তথাপি আমি মনে করে বলছি শোন'। 'ইক্ষ্বাকু বংশজাত রাম নামে এক বিখ্যাত রাজা আছেন তিনি সর্বগুণান্বিত, কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন। গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রতুল্য আর ধৈর্যে হিমালয় তুল্য'। এরপর নারদ শ্রীরামের দৈহিক সৌন্দর্য্যের কিছু কথা বললেন—'শ্রীরামের বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক ও ললাট সুগঠিত বীরোচিত। তিনি আয়তনেত্র ও শুভ লক্ষণযুক্ত'। দেবর্ষি নারদের অপূর্ব বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্রের যে গুণাবলী ও অঙ্গমাধুর্য ফুটে উঠেছে তা এক দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ 'ভারতাজির', ধর্মভূমি তপোভূমি ভারতবর্ষের প্রধান দু-জন রাষ্ট্রপুরুষ হলেন—ভক্তহৃদয় বিহারী মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র এবং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে রয়েছে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং তাঁর জীবন ছিল লীলাবৈচিত্র্যে পূর্ণ যা অনেক সময় আপাতবিরোধী বলেও মনে হতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে হলে প্রয়োজন সূক্ষ্ম বিচার ও অনুশীলন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের জীবন হলো মর্যাদার নিয়ন্ত্রণে বাঁধা, স্বচ্ছ হৃদয়স্পর্শী ও সর্বজনগ্রাহী। রামচন্দ্র যেন আমাদেরই ঘরের এক অতি আপনজন। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে ফুটে ওঠে ভারতীয় তথা হিন্দু-জীবনাদর্শের এক সুন্দর মাধুর্যমণ্ডিত ছবি। তাই আদর্শ ভারত রচনার ক্ষেত্রে বারবারই উঠে এসেছে রামরাজ্য স্থাপনের কথা।

শ্রীরামের জীবন ছিল মন্ত্রপূত লক্ষ্মণরেখার দ্বারা যেন পরিবৃত। তিনি তাঁর জীবনে অনেক বেদনাদায়ক বা জটিল পরিস্থিতিতেও মর্যাদার এই লক্ষ্মণরেখা কোনওদিন অতিক্রম করেননি। তিনি যাঁর যা মর্যাদা বা মান্যতা প্রাপ্য তাঁকে দান করতেন যথাযথ সেই মর্যাদা। আবার বিপরীত পক্ষে তিনিও পুত্র হিসেবে, ভ্রাতা, প্রভু বা বন্ধু হিসেবে অথবা স্বামী ও রাজারূপে নিজের আচরণ সম্বন্ধে সাবধান থাকতেন, যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। বর্তমান সমাজে ভারতের এই মর্যাদা রক্ষার আদর্শ যেন বহু ক্ষেত্রে ধূলিলুণ্ঠিত হচ্ছে। তাই আজ ভারতবাসীর উচিৎ রামচন্দ্রের আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা।

শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ, কর্তব্যপরায়ণতা ও মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে তাঁর জীবনের অসাধারণ দিকগুলি রামায়ণে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

মন্ত্রবিদ অস্ত্রবিদ্ ঋষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন কিন্তু রাবণের দুজন অনুচর মারীচ ও সুবাহু মাংস রক্ত নিক্ষেপ করে অপবিত্র করছে যজ্ঞস্থল। তখন বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে উপস্থিত হয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে চাইলেন যজ্ঞস্থল রক্ষা করার জন্য। রাম তখন নিতান্তই বালক। দশরথ চিন্তিত হলেন—কেমন করে বালক রাম মহাবল রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? তিনি বললেন, 'রামের বিচ্ছেদে আমি ক্ষণকালও বাঁচতে পারবো না'। পরে কুলগুরু বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাম-লক্ষ্মণকে তুলে দিলেন বিশ্বামিত্রের হাতে। তাঁরা উপস্থিত হলেন সরযু নদীর তীরে। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গুরু বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম আচমন করে নদীতীরে বসলেন একান্ত অনুগত শিষ্যর মতো। বিশ্বামিত্র রামকে দীক্ষা দিয়ে 'বলা ও অতিবলা' নামে দুটি মন্ত্র দান করলেন। বিশ্বামিত্র বললেন, 'গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন'—সকল জীবের রক্ষার জন্য তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ কর। তারপর বলছেন, রাম, তুমিই উপযুক্ত আধার, আমার সকল তপস্যা ও সিদ্ধি তোমাকে দান করবো।

এখন রাম আর রাজপুত্র নন, তিনি গুরুগত প্রাণশিষ্য। রাম গুরুদেবের নির্দেশে নদীর তীরে তৃণশয্যায় শয়ন করে রাত কাটালেন। রাত্রি প্রভাত হলে বিশ্বামিত্র ডাকছেন রামকে 'উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং 'দৈবমাহ্নিকম্' হে নরশার্দূল রাম, ওঠ শয্যা ত্যাগ কর, এ সময়ে আহ্নিক ও দৈবকর্ম করা বিধেয়। রাম গুরু-আজ্ঞায় স্নানাদি সমাপন করে সন্ধ্যা বন্দনা করলেন। আবার সেই রামই অস্ত্রগুরু বিশ্বামিত্রের আদেশ মান্য করে স্ত্রীজাতি হলেও বধ করলেন অত্যাচারিণী তাড়কা রাক্ষসীকে। কারণ গুরুদেব বলেছেন, 'স্ত্রী হত্যাজনিত পাপের ভয় কোরো না;প্রজা রক্ষার জন্য রাজাদের এসব কর্ম করাই সনাতন ধর্ম' (বা. রামায়ণ ১/২৫, ১৮-৯৯)।

বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে এসে ছ'দিন মৌন থেকে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ওই ক'দিন নিদ্রা পরিত্যাগ করে যজ্ঞস্থল রক্ষারূপ গুরুসেবায় ব্রতী হলেন। ছ'দিনের দিন মারীচ, সুবাহু অনুচরগণের সঙ্গে রুধির বর্ষণ করে যজ্ঞবেদী অপবিত্র করতে লাগলো। রাম বাণাঘাতে মারীচের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে তাকে বহুদূরে মহাসাগরে নিক্ষেপ করলেন এবং সুবাহু ও অন্যান্য রাক্ষসদেরও বধ করলেন। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। বিশ্বামিত্র রামকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'মহাবাহু! আমি কৃতার্থ হয়েছি, তুমি গুরুবাক্য রক্ষা করেছ, এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হলো'। শ্রীরাম এমনই ছিলেন নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও কর্তব্যপরায়ণ এবং গুরুদেবের প্রতি মর্যাদা রক্ষাকারী।

বিশ্বামিত্র রামকে মিথিলায় নিয়ে গেলেন। রাজা জনক তাঁদের স্বাগত জানালেন। দেবী সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ সম্পন্ন হলো। রাজা দশরথ, ঋষি বশিষ্ঠ প্রভৃতির সঙ্গে রাম অযোধ্যায় ফিরছেন। কিশোর রামের শক্তি পরীক্ষা করতে বাণ ও কুঠার হস্তে পরশুরাম পথ অবরোধ করলেন। দশরথের কাতর মিনতিও পরশুরাম অগ্রাহ্য করে রামকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। পরশুরামের ঔদ্ধত্যে রাম ব্যথিত হয়ে ধনুতে বাণ যোজনা করলেন। বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ এবং আমার অস্ত্রগুরু ঋষি বিশ্বামিত্রের আত্মীয়, তাই আমি আপনার প্রাণনাশ করবো না। কিন্তু হয় আপনার গতিশক্তি না হয় আপনার তপস্যার ফল নষ্ট করে দেব'। পরশুরামের তেজ শ্রীরামে সঞ্চারিত হলো, ভার্গব নির্বীর্য হয়ে গেলেন। ভার্গবের অনুরোধে রাম তাঁর তপোবল নষ্ট করে দিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য, আবার পরশুরাম গুরুদেবের আত্মীয় তাই রাম শাস্ত্রবিধি মেনে ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের মর্যাদা রক্ষা করলেন, পরশুরামকে বধ করলেন না। কিন্তু রাজধর্মানুসারে তাঁর শাস্তি বিধান করলেন। একই সঙ্গে রাম এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে দিয়ে শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করলেন তাঁর অপূর্ব আচরণের মাধ্যমে।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রতিটি গৃহে ধবজপতাকা উত্তোলিত হয়েছে। গৃহাভ্যন্তর অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত। রামের মঙ্গল কামনায় মা কৌশল্যা সারারাত বিষ্ণুপূজা করেছেন। রাম ও সীতা সংযম পালন করে ভূমিশয্যায় শয়ন করেছেন। সব মিলিয়ে যখন একটি শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হতে যাচ্ছে তখন ঘটে গেল এক করুণ ঘটনা। রাত্রি প্রভাত হতেই মন্ত্রী সুমন্ত্রের আহ্বানে রাম মাতা কৈকেয়ীর ভবনে উপস্থিত হলেন। কৈকেয়ী সরল স্বভাব সত্যবাদী রামকে দশরথের দেওয়া দুটি বরের কথা শুনিয়ে বললেন, 'নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও নিজেকে সত্য প্রতিজ্ঞ করতে ইচ্ছা কর তাহলে তুমি এইসব অভিষেক সম্ভার ত্যাগ করে চৌদ্দ বছর যাবৎ জটাবীর ধারণ করে দণ্ডকারণ্যে বাস কর, আর ভরত রত্নপূর্ণ অশ্বরথ সমন্বিত এই রাজ্য শাসন করুক'। রাম এই বরদানের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না এবং রাজা দশরথ রামকে নিজমুখে এই নিষ্ঠুর আদেশ দিতেও পারেননি। তিনি 'হা রাম'! বলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। এরূপ দুঃসংবাদ বা কঠোর আদেশ শুনে অভিষেকের প্রাক্ মুহূর্তে কার না চিত্ত বিচলিত হয়! কিন্তু কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে রামের অল্পমাত্রও শোক বা ব্যথা হলো না 'ইতীব তস্যাঃ পুরুষং বদন্ত্যাং ন চৈব রামং প্রবিবেশ শোকম্' (বা. রা)।

শ্রীরাম কৈকেয়ীকে শান্তভাবে বললেন, 'মা, তাই হোক, আমি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য জটা-বল্কল ধারণ করে বনবাসের জন্য যাত্রা করছি'। আরও বললেন, 'রাজা দশরথ আমার পিতা গুরু হিতৈষী, আমি তাঁর নিয়োগে কোন্ প্রিয়কাজ করতে না পারি? আর ভরত আমার ভাই, আমি ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, ঐশ্বর্য, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু এমন কি সীতাকেও দান করতে পারি;আর এতে আমার আনন্দই হবে'। শ্রীরাম এখানে বিমাতা কৈকেয়ী, পিতা ও ভ্রাতার প্রতি যে সৌজন্য ও মর্যাদার পরিচয় দিলেন, যে ত্যাগের উদাহরণ স্থাপন করলেন তা মনে হয় বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। কৈকেয়ীর ভবন ত্যাগ করার সময় দ্যুতিমান রাম সংজ্ঞাহীন সীতা ও আনন্দিতা মাতা কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করে, প্রদক্ষিণ করে অন্তঃপুর থেকে নির্গত হলেন 'বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্'।। (বা. রা) চ

তিন'শ পঞ্চাশজন বিমাতা রামকে শেষবারের মতো দর্শন

করার জন্য সমবেতা হয়েছেন। রাম তাঁদের দিকে চেয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'একত্র বাসকালে অজ্ঞানতার জন্য যদি কোন অন্যায় আচরণ করে থাকি তবে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন'। রামের কথা শুনে রাজপত্নীগণ শোকে রোদন করতে লাগলেন। পরে দণ্ডাকারণ্যে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে ভরত এসেছিলেন রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তখন ভরত মাতা কৌশল্যার প্রশংসা ও নিজমাতা কৈকেয়ীর অনেক নিন্দা করেছিলেন। রাম স্নেহবশে ভরতকে বলেন, ভরত! তোমার মা অজ্ঞানতা বশে যা করেছেন তারজন্য তাঁর নিন্দা করো না। আর তোমার কিছু মাত্র দোষ নেই, পিতা তোমাকে যা দিয়ে গেছেন তা তুমি ভোগ কর।

শ্রীরাম ছিলেন প্রজাবৎসল। বনবাসে যাবার পূর্বে তাঁর নিজস্ব যা কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল সেগুলি লক্ষ্মণের মাধ্যমে বিভিন্নজনকে দান করেছিলেন। বশিষ্ঠপুত্র সখা সুযজ্ঞকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে তাঁকে রত্নভূষিত পর্যঙ্ক দিলেন এবং তাঁর ভার্যার জন্য দিলেন হার, কেয়ুর অঙ্গদ প্রভৃতি নানাবিধ অলংকার। রামের আদেশে লক্ষ্মণ অগস্ত্য কৌশিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এবং মন্ত্রী চিত্ররথকে বহু ধেনু, ধনরত্ন, বস্ত্র, যান প্রভৃতি দান করলেন। তিনি শোকাকুল ভৃত্যগণকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বললেন—'আমরা যতদিন না ফিরে আসি তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে বাস করবে'। ত্রিজট নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠের সমস্ত ধেনু ও বৃষভ দান করলেন। শ্রীরাম ছিলেন ধনী-দরিদ্র সকল প্রজাগণের প্রতিই সমান মর্যাদা রক্ষাকারী। তাঁর আচরণ ছিল গীতাবর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মতো—তিনি ছিলেন দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে স্পৃহাশূন্য— 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'। প্রজারা এবং পশুরা পর্যন্ত সেজন্য রামকে ভালবাসতেন একান্ত আপনজনের মতন।

সুমন্ত্র রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছেন অযোধ্যার সীমা পর্যন্ত। তাঁর অদর্শনে হস্তিরা মত্ত ও কুপিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হল, অশ্বসকল চঞ্চ ল হয়ে হ্রেষারব করতে লাগলো। গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্তজন যেমন জলের দিকে ছোটে সেরূপ আবালবৃদ্ধ সকলেই রামের পশ্চাতে ধাবমান হল 'রামমেবাভিদুদ্রার ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা' (বা. রা)। এই ঘটনা প্রজাগণের প্রতি রামচন্দ্রের ভালবাসা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়।

শ্রীরাম তাঁর জীবনে বন্ধুর প্রতি অপূর্ব মর্যাদা স্থাপন করেছেন। যেমন সখা বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের প্রতি তাঁর ব্যবহার মাধুর্য দেখা গেল তেমনি তিনি সাধারণ জনজাতি নিষাদরাজ গুহকের প্রতিও অপূর্ব মর্যাদা দেখিয়েছেন। গুহকও ছিলেন তাঁর প্রিয়তম সখা। রামের রথ গঙ্গার তীরবর্তী প্রদেশে উপস্থিত হলো। গুহক সদলবলে নানাবিধ আহার্য দ্রব্যসহ বহুমূল্য অনেক উপহার নিয়ে সখা রামের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সুগোল বাহু দ্বারা গুহককে আলিঙ্গন করে রাম বললেন, 'গুহক, তুমি পদব্রজে এসে যে স্নেহ দেখালে তাতেই আমরা সৎকৃত ও তৃপ্ত হয়েছি। তোমার সমস্ত কুশল তো? তুমি প্রীতিবশে যে সব উপহার এনেছ তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। আমাকে এখন কুশচীর অজিনধারী ফলমূল ভোজী তাপস বলে জেনো'। গুহক লক্ষ্মণকে বলেছেন—'লক্ষ্মণ, তোমাকে সত্য বলছি রামের অপেক্ষা প্রিয় আমার কেউ নেই'। আবার হনুমানজীর দৌত্য ক্রিয়ার মাধ্যমে বিধিবৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করে, অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ অগ্নি সাক্ষী করে রাম বন্ধুত্ব স্থাপন করেন সুগ্রীবের সঙ্গে। হনুমানকেও আলিঙ্গন করে শ্রীরাম তাঁকেও সম্মানিত করেন। বন্ধুর মর্যাদা রক্ষা করতে রাম বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করেন কিষ্কিন্ধারাজ্যে। বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ থেকে জনজাতি বানরজাতি পর্যন্ত সকলের সঙ্গে রামচন্দ্র বন্ধুত্বের মর্যাদা দেখিয়েছেন।

তখনকার দিনে বহুপত্নী গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল সমাজে। রাজা দশরথেরই ৩৫০ জন মহিষী ছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম সমাজে স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত মর্যাদার ভাব স্থাপনের জন্য গ্রহণ করেছিলেন একপত্নীব্রত। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থানকালে রামচন্দ্র কয়েকটি যজ্ঞ করেছিলেন। নিয়ম আছে শাস্ত্রে যে, গৃহস্থ যজমান সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হবেন। কিন্তু রাম যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার জন্য অনেকে পরামর্শ দিলেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেননি। ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীরাম সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি পাশে বসিয়ে যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। রাম বললেন, 'কাঞ্চ নীং মম পত্নীং চ দীক্ষায়াং জ্ঞানশ্চ কর্মণি' (বা. রা. ৯০/২৫) স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা স্থাপনের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আজীবন সীতার প্রতি রামের প্রেম ও মর্যাদাবোধ ছিল অটুট।

গুরু, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রবিধি প্রভৃতির প্রতি রাম যেমন যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন, তেমনি আবার পিতা মাতা বন্ধু প্রজা সকলের প্রতিই যাঁর যেমন সম্মান প্রাপ্য তাঁদের সেভাবেই সম্মান প্রদান করে ভারতের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে তিনি এক অপূর্ব উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। বর্তমান সময়ে মর্যাদার অবক্ষয়ের যুগে ভারত তথা বিশ্ববাসীর মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে জীবনে একান্তভাবে অবলম্বন করা উচিৎ।

রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র

ডঃ প্রীতিমাধব রায়

সমগ্র ভারতীয় রাজকুল রামরাজ্যকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ বলে মনে করেছেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া তাঁদের মহত্ত্বের শেষ কথা। বাংলার পালবংশের বিখ্যাত রাজা রাম পালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রাজার জীবনে রামচন্দ্রের ছায়া ফেলে রামচরিত রচনা করেন। ভবভূতির উত্তর রামচরিত, কালিদাসের রঘুবংশম্ রামের সর্বকালীন খ্যাতির প্রকাশ।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্র হলো একটি প্রতিষ্ঠান যার চারটি অঙ্গ আছে। প্রথমটি হলো একটি মানবগোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়কারী এক শক্তির কারণে নিজেদের একই সত্ত্বার অন্তর্গত বলে মনে করে, দ্বিতীয়টি হলো এক ভূখণ্ড যেখানে ওই মানবগোষ্ঠি বাস করে, যাকে তারা নিজেদের দেশ বলে মনে করে এবং ওই দেশকে তারা পরম আত্মীয় বলে মনে করে, তৃতীয়টি হলো একটি পরিচালক বা কার্যকারী প্রতিষ্ঠান যা ওই মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ করার জন্য, সামূহিক ভালমন্দ দেখার জন্য সৃষ্ট, আর চতুর্থটি হলো ওই প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। ওই চারটি সত্ত্বা যত বেশী সার্থক হবে, রাষ্ট্রটিও হবে তেমনই সার্থক।

গ্রীক মনীষী আরিস্ততল তাঁর 'পলিটিকস্' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, রাষ্ট্র হলো 'ভাল জীবন' সৃষ্টির জন্য। অবশ্য ভাল জীবন বলতে ঠিক কি বোঝায় তা নিয়ে মত পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন, ওই দেশের মানুষ যদি অত্যন্ত ধনী হয় তাহলেই কি রাষ্ট্রের সার্থকতা, না ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের দীর্ঘতা, শিক্ষার হার, শান্তিময়তা প্রভৃতিই ভাল জীবনের প্রধান উপাদান, তা নিয়ে ভিন্ন মত সম্ভব। তবে একথা সত্য যে মানুষ সুখ শান্তি চায়, আনন্দ চায়, কাজেই সুখী, শান্তিময়, আনন্দময় দেশের রাষ্ট্রই সার্থক রাষ্ট্র, এটা মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই।

সাধারণ মানুষের কাছে রামায়ণ মূলতঃ একটি ধর্মপুস্তক এবং যাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে রামায়ণ রচিত হয়েছে, সেই রামচন্দ্র ধর্মীয় পুরুষ। ভারতের মানুষ রামকে শ্রদ্ধা করে, রাম নাম করে, রামের পূজা করে, তাতে ভয় দূর হয়, সঙ্কট কেটে যায়, পুণ্য হয়, এমন বিশ্বাস ভারতের হিন্দু জনসাধারণের আছে, কিন্তু, বর্তমানকালের চিন্তায় বহু মানুষের কাছে ধর্মচর্চার চেয়ে রাজনীতিচর্চা বড় হয়ে উঠেছে বলে রাষ্ট্র নিয়ে অনেক লোকই বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। এমন কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে, ধর্ম কেবল নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার, দেশ বা রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই, কাজেই রামচন্দ্রেরও বিশেষ গুরুত্ব নেই। একথা এক অনর্থকারী প্রচার।

ভারতবর্ষ এক মহান প্রাচীন রাষ্ট্র। কিন্তু, অধুনা এমন কথাও শোনা যায় যে, ভারতবাসীর সামূহিক রাষ্ট্রবোধ কোনওদিনই ছিল না, ভারতবর্ষ হলো এক ভূখণ্ড যেখানে নানা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের মানুষ, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্মের মানুষ বাস করে, যারা আগে মদ্র, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কোশল, চেদী, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি

নানা ছোট বড় রাজ্যে বাস করত, ভারতবর্ষ বলে একটিমাত্র দেশের কোনও ধারণা বা রাষ্ট্রবোধ তাঁদের ছিল না। প্রধানতঃ বৃটিশ সরকার এদেশ অধিকার করার পর ভারতবর্ষ একটি দেশ বা রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এটি আর এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভ্রান্ত প্রচার। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে কয়েকটি ধাঁচে ভাগ করেছে, যেমন, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি। বর্তমানকালে গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় সেই ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট নয়। বর্তমনে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, যেখানে সরকার গঠিত হয় অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভোটের দ্বারা, সেটাই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র-সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ।

ভারতসহ অনেক দেশকেই আজ গণতন্ত্র বলা হয়, কারণ ওই রাষ্ট্রগুলিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওইসব দেশে বিরাট ধনবৈষম্য, প্রকট দারিদ্র্য, সামাজিক অশান্তি আছে। কয়েক বৎসর অন্তর ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, এমন বহু মানুষ আছে, যাদের জীবনধারণের কোনও নিশ্চয়তা নেই, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো কোনও আয় নেই, তাহলে কেবল ভোট দিতে পারার আনন্দেই কি মানুষ তুষ্ট থাকতে পারে? নিশ্চয়ই নয়।

রামরাজ্যে প্রত্যেক মানুষের ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো সেখানে মানুষ সুখে ছিল। রাজা মনে করতেন, প্রতিটি প্রজা তাঁর সন্তানতুল্য, তাদের প্রত্যেককে অভাবহীন, শঙ্কাহীন, সুখী ও ধর্মপ্রাণ রাখা তার অবশ্য কর্তব্য। প্রজা অসুখী হলে সেই অপরাধের দায় রাজার উপরে এসে পড়ে। আপনি যাকে ভাল জীবন বলেছেন, তাঁর যুগের মানদণ্ডে, রামরাজ্যে তা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় রামচন্দ্রকে দেবতা বলে বিশ্বাস করেননি, কিন্তু আদর্শ রাজা ও সর্বোপরি আদর্শ মানুষ বলে মনে করেছেন। রামরাজ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ একথা গান্ধীজী বারবার বলেছেন। যে রাজার রাজত্বে এই আদর্শ স্থাপিত হয়, তিনিই তো প্রকৃত রাষ্ট্রপুরুষ। সেই সংজ্ঞায় রামচন্দ্র প্রতি যুগেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুরুষের আদর্শ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে প্রজাসুখই কি রাষ্ট্রের একমাত্র কথা, প্রজাদের মতামত, তাদের ইচ্ছার কি কোনও মূল্য নেই। এমন রাষ্ট্র যদি হয় যেখানে প্রজারা রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রীতদাস, কিন্তু রাষ্ট্র তাদের খাওয়া পরার সুখে রেখেছে, তাহলে কি তাকে ভাল রাষ্ট্র বলা যাবে?

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, রামচন্দ্র প্রজার মতামতকে যতটা গুরুত্ব দিতেন প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত তা অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে বহু সমালোচক এই প্রজামতকে অতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রামচন্দ্রের নিন্দা করেছেন, যা হলো সীতার বনবাসের কাহিনী। সাধারণ প্রজাদের একাংশ সীতা রাবণগৃহে বন্দী থাকার কারণে তাঁর অপবাদ দিলে প্রজাদের দেওয়া সেই অপবাদ মিথ্যা জেনেও রাম সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। অনেকে যুক্তিপূর্ণ ভাবেই একথা বলেন যে, মিথ্যা অপবাদে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করা রামচন্দ্রের পক্ষে অনুচিত হয়েছিল।

মনে রাখা দরকার এইখানেই মানুষ রাম আর রাজা রামের মধ্যে পার্থক্য। গৃহধর্মের দিক থেকে রামচন্দ্রের উচিত হোত মিথ্যা অপবাদকে তুচ্ছ করে সীতাদেবীকে রাজপুরীতে রাখা। কিন্তু রাজার আদর্শ সাধারণ মানুষের আদর্শ থেকে ভিন্ন। রামচন্দ্র রাজবংশের মর্যাদাকে ব্যক্তিধর্ম, ব্যক্তিসুখের উপরে স্থান দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন মর্যাদাপুরুষোত্তম রাজা রাম।

অবশ্য রামচন্দ্র মহীয়সী সীতাদেবীকে অসহায় অবস্থায় বনবাসে পাঠাননি, তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দিয়ে সীতাদেবীকে মহামুনি বাল্মিকীর আশ্রমে প্রেরণ করেন। ওই অবস্থায় সীতাদেবীর গর্ভে ছিলেন লব ও কুশ নামক রামচন্দ্রের সন্তানেরা। অনেকেরই মতে সন্তান সম্ভাবনার পর, বিশেষতঃ যে সন্তানেরা অদূর ভবিষ্যতে আদর্শ রাজা হবেন, তাদের আগমনের সূচনায় রাজার কর্তব্য হলো, আদর্শ সন্তান বা ভবিষ্যত রাজাদের উপযুক্ত ভাবে গঠন করা। রামচন্দ্র জানতেন যে, বাল্মিকী আশ্রমে তার পুত্রেরা যেভাবে মানুষ হবেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদেও তা সম্ভব হবে না, কাজেই নিজের সুখ শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে তিনি সীতাদেবীকে বাল্মিকী আশ্রমে পাঠান। মনে রাখা দরকার রামচন্দ্র নিষ্ঠাবান এক প্রতীক ছিলেন। সে যুগে রাজাদের পক্ষে বহু বিবাহ করা নিন্দনীয় ছিল না, বরং সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রের স্মরণে ছিল যে তাঁর পিতা দশরথ বৃদ্ধ বয়সে কৈকেয়ীর পাণিপীড়ন করে যে সমস্যার বীজ বপন করেন, রামচন্দ্রের কোনও ইচ্ছা ছিল না। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার। আমরা দেখেছি যে, দশরথের বৃদ্ধ বয়সে তরুণী বিবাহ রাষ্ট্র সমস্যার সৃষ্টি করে, মহাভারতে দেখি যে শান্তনু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সত্যবতীকে বিবাহ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বীজ বপন করেন। রামচন্দ্র কোনওভাবেই সেই রাষ্ট্র সমস্যার সৃষ্টি করতে চাননি, কারণ তিনি ছিলেন রাজা রাম, যাঁর কাছে নিজ সুখ, পরিবার প্রীতির চেয়ে অনেক বড় কথা ছিল আদর্শ রাজ্যশাসন। রামচন্দ্র অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সত্যের ভিত্তিতে। তুলনায় বলা যায় এখনকার রাষ্ট্রগুলি অসত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য নিজেদের মহান গণতন্ত্রী রাজ্যরূপে প্রচার করে থাকে, যে প্রচার একান্তই মিথ্যা। গণতন্ত্র বলতে কেবল নিজের দেশের মানুষদের ভোটের অধিকার বোঝায় না, সমগ্র বিশ্বের মানুষের মর্যাদা, তাদের কল্যাণ বোঝায়, এই হলো গণতন্ত্রের নীতির দিক। কিন্তু ওইসব পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নিজের দেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোন মানুষের কথা ভাবেইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শ্বেতাঙ্গেরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তখন সেখানকার আদিবাসীদের তারা অনেকাংশেই নির্মূল করে, আর বৃটিশ গণতন্ত্র তো অন্য দেশ দখল ও পরপীড়নের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ওইগুলি হলো গণতন্ত্রের পরিহাস।

রামচন্দ্র অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, কিন্তু কোনওভাবেই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজরাজ্য অযোধ্যাকে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করেন, কিন্তু কোন ভাবেই অন্য জাতিকে নিধন করে নয়। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতের সর্বত্র সুশাসন ও স্বশাসন বজায় থাকুক। অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি লঙ্কার সিংহাসন পরিহার

করেন, যদিও লঙ্কা ছিল অযোধ্যার চেয়েও ধনী রাজ্য। নিজ মাতৃভূমিকেই তিনি জননী ও স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করতেন। লঙ্কায় তিনি স্থাপন করেন ধর্মপ্রাণ, সুবিবেচক বিভীষণকে। মধ্যদক্ষিণ ভারতের বানরগণ, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বানর ছিলেন না, ছিলেন এক রামমিত্র জনজাতি, তাঁদের সুশাসন বজায় রাখেন, নিজে আর্য হওয়া সত্ত্বেও রাক্ষসেরা, শবরেরা, বানরেরা, গুহক চণ্ডাল ছিলেন রামচন্দ্রের মিত্র। নিজের শাসনাধিকারে না এনে তিনি সমগ্র ভারতে এক শান্তিপূর্ণ স্ব স্ব শাসনাধীন রাজ্যপুঞ্জ গড়ে তোলেন। যা আজও সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত।

রামচন্দ্রের ভারতবর্ষ এক মহারাজ্য, যা কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তিতে এক ছিল না, ধর্ম, মৈত্রী ও সহমর্মী যুক্ত, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন নৃতত্ত্বের মানুষ স্বাধীনভাবে বাস করবে এক মহারাজ্যপুঞ্জে।

ওই প্রত্যেকটি রাজ্য সহাবস্থান করবে স্বাধীনতা, মৈত্রী, প্রজাসুখ ও ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে। রামচন্দ্র রাষ্ট্রপুরুষ হয়েও ধর্মপুরুষ, কারণ প্রকৃত ধর্ম মানুষকে উদার ও নির্লোভ করে, দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে। ধর্মকে নির্বাসনে পাঠালে দেশ লোভী দুর্নীতিপরায়ণ হয়, যা আজ ভারতবর্ষে ঘটেছে।'

রামচন্দ্রের এই সাফল্য ও খ্যাতি ছিল সারা ভারতে বিস্তৃত। সেইজন্য তাঁর চরিতকথা এত সর্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে এক কৃষিরূপক বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন, যে ভারতের নানা প্রদেশে, নানা ভাষায় রামচরিত পরিজ্ঞাত ছিল, যদিও তাদের বিষয় ও বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্য ছিল।

সংস্কৃত বাল্মিকী রামায়ণের সঙ্গে বাঙালীর প্রিয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পার্থক্য আছে, হিন্দী ভাষায় রচিত তুলসীদাসের রামায়ণের বক্তব্য ধারাতে, তামিল ভাষার কম্বম রামায়ণ, কানাড়ী ভাষায় পম্পা রামায়ণ, রামায়ণ জাতকে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। পরবর্তীকালে বহির্ভারতের দেশ ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ ধর্মে ভিন্ন হলেও রামচন্দ্রের গৌরবগাথা তাঁরা আজও পাঠ করেন, অভিনয় করেন।

সমগ্র ভারতীয় রাজকুল রামরাজ্যকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ বলে মনে করেছেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া তাঁদের মহত্ত্বের শেষকথা। বাংলার পালবঙ্গের বিখ্যাত রাজা রাম পালের সভাকবি সন্ধাকর নন্দী তাঁর রাজার জীবনে রামচন্দ্রের ছায়া ফেলে রামচরিত রচনা করেন। ভবভূতির উত্তর রামচরিত, কালিদাসের রঘুবংশম্ রামের সর্বকালীন খ্যাতির প্রকাশ।

রামায়ণের যে নৈতিক মর্যাদা তার কারণ রামচরিত্রের মহত্ব। রামচন্দ্র সাংস্কৃতিক ভারতপুরুষ। সাংস্কৃতিক দেশ যুগ পরিবর্তনের পরেও অবস্থান করে। গ্রীক দেশের মনীষী সেক্রাতেস, প্লাতো, আরিস্ততল, ইউক্লিড খৃষ্টান ছিলেন না, কারণ তাঁরা ছিলেন খৃষ্টপূর্ব যুগের লোক। কিন্তু বর্তমানের খৃষ্টান গ্রীকেরা তাঁদের গৌরবময় আদিপুরুষ বলে মনে করেন। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। অহিন্দু ভারতবাসীদের অধিকাংশ রামচন্দ্রকে আদি ও আদর্শ রাষ্ট্রপুরুষ বলে মনে করেন না, এমনকি কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু সন্তানও অনুরূপ মানসিকতার ধারক। সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুরুষ রামচন্দ্রের পবিত্র জন্মভূমির মর্যাদা রক্ষায় তাদের এত অনীহা, এত বিরোধ।

ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রথমেই চাই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপুরুষ রামচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষার আগ্রহ, তাঁর আদর্শের প্রতি অনুরাগ, তাঁর মতো চরিত্রনিষ্ঠা। যে চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম।
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

ভাষা ও ছন্দ (কাহিনী)

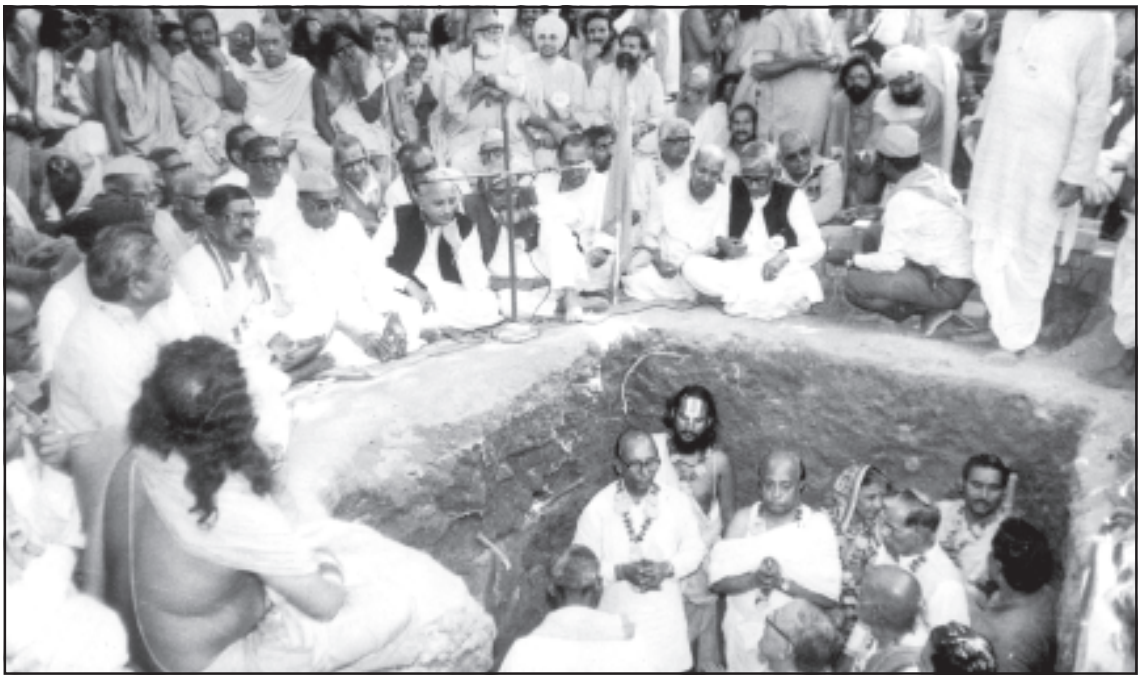

৯.১১.১৯৮৯ তারিখে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের শিলান্যাস।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন

বাসুদেব পাল

বাইরে এপ্রিলের গরম। ভেতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলও আলোচনার উত্তাপে সরগরম। স্থান দক্ষিণ কলকাতার হিন্দী হাইস্কুলের ভূতল সভাগার। উদ্যোক্তা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের একটি সংস্থা। বিষয় 'স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা'। যতদূর মনে পড়ে, বক্তাদের তালিকায় ছিলেন সর্বশ্রী রাম জেঠমালানি, পি এন লেখি, রফিক জ্যাকেরিয়া, সুরেন্দ্রমোহন এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আই এ এস ক্যাডার সৈয়দ সাহাবুদ্দিন। সভার পরিচালক বলে দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বক্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন। তারপর শ্রোতাদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দেবেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ ও প্রশ্ন লেখার কাগজ/স্লিপ শ্রোতাদের সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা, রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সাপ্তাহিক অর্গানাইজার এবং একসময়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক মাদারল্যাণ্ড পত্রিকার সম্পাদক কে আর মালকানি। সব ঠিকঠাকই চলছিল। গোল বাধল সাহাবুদ্দিন সাহেব বক্তব্য রাখার সময়। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন শ্রীরামশিলা পূজনের। শ্রোতারা হৈচৈ বাধিয়ে দিল। সাহাবুদ্দিন থামতে বাধ্য হলেন। হাল ধরলেন সভাপতি মহোদয়। তিনি অনুরোধ জানালেন, সাহাবুদ্দিনকে বলতে দিন। পরে প্রশ্ন করুন। সভা কিঞ্চি ৎ শান্ত। তবে একেবারে নয়।

কে আর মালকানিজী একা 'কুম্ভ'। যথারীতি বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর। সাহাবুদ্দিনকেই বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে বলে জানালেন সঞ্চ ালক বা সংযোজক। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল— ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভারতবর্ষের মহাপুরুষ এবং ভারতবাসীর পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করেন কিনা? অবস্থা, পরিবেশ এমনটাই ছিল যে, সাহাবুদ্দিন স্বীকার করে নিলেন, হ্যাঁ, রাম-কৃষ্ণকে তিনি মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেন।

দেবরাহাবাবা

আসলে সাহাবুদ্দিন এবং তার মতো ভারতের মুসলমানদের মৌরুসীপাট্টাতে ধাক্কা লেগেছিল সেদিনই, যেদিন হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস' জানুয়ারি মাসে সাধু-সন্তদের নিয়ে দেশ জুড়ে শ্রীরামশিলা পূজনের কার্যক্রম ঘোষণা করে। এযুগের প্রবাদপ্রতিম সন্ত বর্তমানে ব্রহ্মলীন যোগীরাজ দেবরাহা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে শিলা পূজনের শুভ সংকল্প গৃহীত হয়। দেবরাহা বাবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রমুখ সূত্রধার অশোক সিংহল এবং শ্রীশচন্দ্র দীক্ষিতকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'শ্রীরামমন্দির হবেই।'

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীরামমন্দির আন্দোলন একটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়কে কোনও রাজনৈতিক দল, নেতা, ব্যক্তি, ঐতিহাসিক এমনকী সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষে অস্বীকার, অবহেলা বা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। নববইয়ের দশকের এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৮৪ সালেই। গঠিত হয়েছিল ধর্মস্থান মুক্তি যজ্ঞ সমিতি। সমিতির প্রধান ছিলেন তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী দাউদয়াল খান্না। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন সাংসদ মহন্ত অবৈদ্যনাথ। প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল শ্রীরাম মন্দিরের বন্ধ তালা খোলার। সেজন্য কেবলমাত্র বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে শ্রীরাম-জানকী রথযাত্রার আয়োজন হয়। ওই রথযাত্রা বিপুল জনসমর্থন লাভ করে। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফৈজাবাদ কোর্টের আদেশে তালা খুলে যায়।

এরপরই শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস' গঠিত হয়। শ্রীরামজন্মস্থান এবং আশপাশের জমিতে যে সকল মন্দির ছিল প্রত্যেকেই জন্মভূমি ট্রাস্টকে জমির মালিকানা হস্তান্তর করেন। পরবর্তী আন্দোলন পরিচালিত হয় সাধু-সন্তদের নির্দেশে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রদ্ধেয় মোরোপন্ত পিংলে (২০০৩-এ পরলোকগমন করেছেন এবং যিনি সেই সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছি-সমিতির সদস্য ছিলেন) সারা দেশের বিপুল জনসাধারণকে এই রামমন্দির পুনর্নির্মাণে সংযুক্ত করার জন্য এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনাই হলো— শ্রীরামশিলা পূজন। ভারতবর্ষের প্রতি দু'হাজার জনবসতিকে একটি একক (উপযুক্ত) ধরা হয়। এই জনবসতির এক একটি ভারতীয় হিন্দু পরিবার কমপক্ষে চারটি ইঁটের দাম দেবেন। প্রতিটি ইঁটের দাম পাঁচসিকে। চারটির দাম পাঁচ টাকা। ওই পাঁচ টাকার কুপন দিয়ে টাকা নেওয়া হবে। প্রতি দু'হাজার জনবসতিতে একটি শ্রীরামশিলা পূজা হবে। ইটের উপর শ্রীরাম লেখা বা খোদাই করা থাকবে। সেখানে উপখণ্ডের সকলে একত্রে আসবেন। শ্রীরামশিলা পূজন করে সংকল্পমন্ত্র পাঠ করবেন। অঞ্জলি দেবেন। পরে ওই পূজিত (রামশিলা) ইষ্টকখণ্ড জেলাকেন্দ্র এবং পরে প্রদেশকেন্দ্রে জমা হবে। নির্দিষ্ট দিনে প্রদেশে বড় জনসভা হবে। প্রদেশের লাগোয়া অন্যান্য দেশ থেকেও ওইরকম পূজিত শ্রীরামশিলা প্রদেশকেন্দ্রে আসবে। সেখান থেকে বজরং দলের সদস্যদের পাহারায় ওইসকল পূজিত শিলা সড়কপথে অযোধ্যায় পাঠানো হবে। এইরকম পরিকল্পনা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়— শ্রীরামশিলাপূজন সমিতি। সমিতির সভাপতি হন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ এবং সম্পাদক হন কিংকর তপানন্দ মহারাজ। তপানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঁকারনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীরামশিলা পূজন সমিতির মধ্যে ছিলেন ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শিলাপূজন সম্পন্ন করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগ দেন। ওই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধুনা স্বর্গত ঢাকুরিয়ার বিখ্যাত মুখার্জী পরিবারের শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

পত্র-পত্রিকায় রামশিলাপূজন নিয়ে পুরোদমে আলাপ-আলোচনা কটু-কাটব্য শুরু হয়ে যায়। সিপিএম সহ অন্য বামদলগুলোর ক্যাডারবাহিনী নেতাদের উস্কানি পেয়েই ময়দানে নেমে পড়ে। প্রায় প্রতিটি রামশিলা পুজোয় প্রত্যক্ষ শারীরিক বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। এ যেন শারদীয়া পুজোর আগেই রাম-রাবণের লঙ্কাকাণ্ড।

হিন্দুস্থানে হিন্দু সংগঠনই সব সময় রাজনীতিবিদদের বলির পাঁঠা। রামশিলাপূজনের কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে বামপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলে দেন তাদের খাসতালুক পশ্চিমবঙ্গে ইঁট-টিট পুজো হবে না। যথারীতি হিন্দুত্ববাদী রামমন্দিরপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জকে খোলামনে গ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সমিতির সদস্য ডঃ প্রীতিমাধবরায় বললেন, সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। আমরা যা খুশী পুজো করতে পারি।

রামশিলা পুজোর বিরোধিতায় নামে শাসক দলের ভৈরববাহিনী, তাদের সহযোগী দাসানুদাস 'পুলিশ-প্রশাসন' এবং অতিবাম রাজনীতিক দলের ক্যাডাররা। তবে কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন। তখনকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রধান বিকাশকলি বসুকে এরকম ব্যতিক্রমী হিসেবেই গণ্য করা যায়। যতদূর মনে আছে সর্বপ্রথম

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন হয়েছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে—বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বনামধন্য সন্ন্যাসী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুবক্তা স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ।

দক্ষিণ কলকাতায় বিজয়গড়ে শ্রীশ্রীদুর্গাপুজোর সময় প্রধানত স্থানীয় কংগ্রেসীদের উদ্যোগে ভারতমাতার পুজো হয়। এই পুজো একসময় শুরু করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। পরে তা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনকার কংগ্রেসীরা। ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় ময়দানে ভারতমাতা পুজোর উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হন স্বামী বিজয়ানন্দ এবং ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। সম্ভবত, চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন ওই অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জ্যোতি বসুকে 'কুলাঙ্গার' বলে মন্তব্য করেন। ফলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো ভালো ঝাল-মশলা পেয়ে যায় পরিবেশন করার জন্য।

রামশিলা পুজো নিয়ে রীতিমতো রাজনীতি শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে কোনও রাজনৈতিক দল সমর্থন করবে কিনা! একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের পালমপুর (হিমাচল প্রদেশ) অধিবেশনেই শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণের সমর্থনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দলের সর্বোচ্চ সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে দলের সর্বস্তরে শ্রীরামমন্দিরের জন্য যাবতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

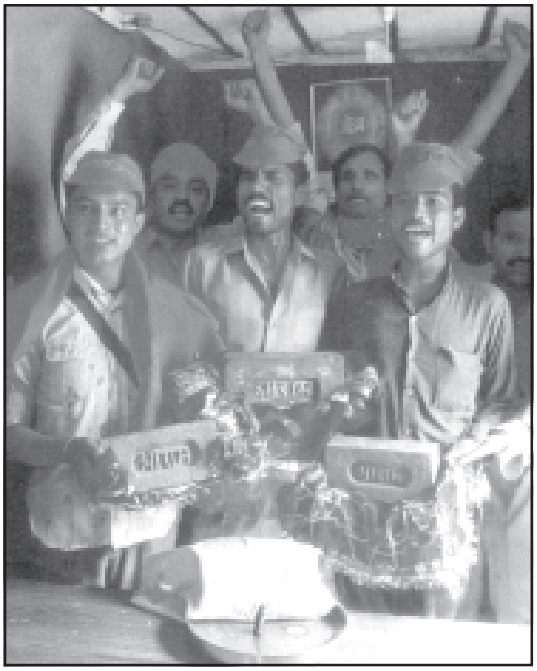

শিলাপূজন

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় মন্দিরে মন্দিরে শ্রীরামশিলা পূজনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় পুজোর আগে থেকেই। বামপন্থীরা বিরোধিতা শুরু করে।

দক্ষিণ কলকাতার শ্রীকলোনী মোড়ে পথসভায় হামলা চালায় সি পি এম মদতপুষ্ট মস্তানরা। তারা প্রচারগাড়ী ভাঙচুর করে মাইক লুট করে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে দুই মস্তান হলো কুখ্যাত 'ছানু ও পিনপিন'। আরও অনেকে ছিল। জনৈক সিটু নেতা তাতে নেতৃত্ব দেন। যাদবপুর থানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এফ আই আর করা হয়। বলা বাহুল্য কোনও কাজ হয়নি। দুর্গাপুজোর সময় তদানীন্তন বিজেপি কাউন্সিলার শান্তিলাল জৈন পূজামণ্ডপেই শ্রীরামশিলা পূজা করেন। ওদিকে রাজধানী দিল্লীতেও বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীজী একইরকম পদ্ধতিতে দুর্গাপূজামণ্ডপে শ্রীরামশিলা পূজন করেন। ফলে সারা দেশজুড়ে সদর্থক রামভাবনা ও রামভক্তির পরিবেশ তৈরি হয়। আর ভক্তিতেই শক্তি। বামেরা এই আপামর রামভক্তিকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তারা সর্বতোভাবে এই অনুষ্ঠান বানচাল করতে উঠেপড়ে লাগে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি'। ফলে দেশজুড়ে মুসলমান সমাজকে বাবরের নাম করে মসজিদের সুড়সুড়ি দিয়ে পিছন থেকে লড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সফল হয়।

বর্ধমান জেলার গলসী থানার পোড়শুড়া গ্রামে হিন্দুরা শ্রীরামশিলা পূজনের ব্যবস্থা করলে মুসলমানরা সেখানে আক্রমণ করে। ভাঙচুর চালায়। যথারীতি খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং শিলাপূজন স্থগিত করে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়। রাতভর উত্তেজনা। পুলিশ মোতায়েন। একদিকে ছালালপুর গ্রামের মুসলমানরা দারুণভাবে তৈরি। অন্যদিকে নিরস্ত্র হিন্দুরা রাগে ক্ষোভে অপমানে ফুঁসছে। রাত্রি প্রায় একটা নাগাদ আসরে অবতীর্ণ হলেন বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নওলকিশোর সিং। উনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন জেলা প্রচারক অমরকৃষ্ণ ভদ্রকে অনুরোধ করে রাজী করালেন—আপাতত রামশিলা পূজন বন্ধ করতে। কথা দিলেন, নতুন দিন ঠিক করে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে নিজে উপস্থিত থেকে শিলাপূজন অনুষ্ঠান করাবেন। পরে তিনি কথা রেখেছিলেন। তিনদিন বাদেই একই স্থানে শিলাপূজন সুসম্পন্ন হয়।

কলকাতার একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে শিলাপূজনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাঘাযতীন এলাকার শ্রীকলোনীমোড় থেকে ভিতর দিকে একটু এগিয়ে গেলেই মাঠের পাশে অ্যাডভোকেট দেবীদাস গাঙ্গুলীর বাড়ি। দেবীদাসবাবু ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন বাড়িতে ঘটা করে শ্রীরামশিলাপূজন করবেন। যেমন বলা, তেমনই কাজ। বাড়ির সামনে ম্যারাপ বেঁধে অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই যাদবপুর থানা থেকে একভ্যান পুলিশ হাজির। ভারতবর্ষে পুজোর উদ্দেশ্যই হলো শান্তি, বিশ্বশান্তি বিশ্বমঙ্গল কামনা। দিকে দিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে...। অশান্তির কোনও প্রশ্নই নেই। তবুও অশান্তি অশান্তি বলে অশান্তি লাগানোর রাজনৈতিকভাবে যাবতীয় অপপ্রয়াস চলেছিল পুরোদমে। পুজো হল, হলো খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ। উপস্থিত পুলিশকর্মীরাও প্রসাদ পেয়ে ধন্য। রাইটার্সে নিউসেক্রেটারিয়েট

বিল্ডিং-এ কর্মরত এক বন্ধু খবর দিলেন—দেবীদাসদার বাড়িতে পাড়ার কমরেড বন্ধুরা রামশিলা পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে এসেছে। কমরেডদের নাক কাটা গেল। হৈ হৈ রৈ রৈ হলো রাইটার্সে।

উত্তেজনার পারদ সব থেকে চড়ে ঐতিহাসিক করুণাময়ী কালীমন্দিরে শ্রীরামশিলাপূজন অনুষ্ঠান নিয়ে। পুরোহিত মশায় শ্রীরামশিলাপূজন করবেন জেনে ঠাকুরপুকুর থানার ও.সি. তাঁকে শাসিয়ে যান। এই নিয়ে সংবাদপত্রে চাপানউতোর শুরু হয়। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় একেবারে তৎকালীন রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক শ্রীযুক্ত বিকাশকলি বসুকে। তিনি সদর্থক আশ্বাস দেন। পুজোর দিন সকাল থেকেই দু'গাড়ি পুলিশ মোতায়েন হয় মন্দিরের বাইরে। সর্বত্র রটে যায় পুজো বন্ধ করতে আক্রমণ হতে পারে। স্থানীয় কর্মকর্তা রবীন্দ্রলাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এলাকার জনসাধারণ হিম্মতের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান। পুজো শুরু হতেই বিরাট মন্দির চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মাতৃমূর্তির সামনে মহাসমারোহে শ্রীরামশিলাপূজন অনুষ্ঠান হয়। কিছু সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছিলেন। নির্বিঘ্নে সবকিছু সম্পন্ন হতে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। খবর করার রসদ পেলেন না। এসময় কলকাতার মানিকতলার এক মন্দিরে পুজোতে বাধা দেয় সি পি এম মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। বাধা দেওয়া হয় সল্টলেক সংলগ্ন মহিষবাথানে। বাধার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চার হাজার স্থানে শ্রীরামশিলা পূজন হয়। দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটি মন্দিরে শ্রীরামশিলাপূজন হয়। তাদের মধ্যে যাদবপুরের শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন অন্যতম। শিলাপূজন হয় বাঁশদ্রোণীর প্রাক্তন জমিদার ঁহীরেন্দ্রলাল সরকারের বাড়িতে। সেখানে স্পেশাল ব্রাঞ্চে র এক ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে এসেছিলেন। সেবছর (১৯৮৯) হরিদ্বারেই ঠিক হয়েছিল ৯ নভেম্বর অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে অনুপম মন্দির নির্মাণের দ্বিতীয় ধাপে শিলান্যাস হবে। যতই দিন এগুতে থাকে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় রাজধানীতে। শিলান্যাস নিয়ে রাজধানীর রাজনীতি উত্তপ্ত হচ্ছিল। এদিকে কলকাতায়ও উত্তেজনা দেখা দিল যখন ঘোষণা হয়—কলকাতার চারটি স্থান থেকে পূজিত শ্রীরামশিলা নিয়ে রামভক্তরা শোভাযাত্রা সহকারে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ময়দান এলাকায় সম্মিলিত হয়ে জনসভা করবেন। সেই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পাদক শ্রী অশোক সিংঘল।

জনসভার স্থানের আর্জি জানাতেই নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অজুহাতে ব্রিগেড প্যারেড ময়দান ও শহীদ মিনার ময়দান পুলিশের তরফ থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়। এমনকী শোভাযাত্রার অনুমতি দিতেও সরকার ও প্রশাসন রাজী নন। ৮৯' নভেম্বরের ৫ তারিখ জনসভার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। তখন শ্রীরামশিলা পূজন সমিতির তাবৎ কাজকর্ম পরিচালিত হোত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কার্যালয় ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ থেকে। প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের জন্য এক ছোট্ট কমিটি গড়া হয়। সেই সমিতিতে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধে য় অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। যিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন—স্বনামধন্য হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজিত ধর। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর কলকাতা মহানগর সঙঘচালক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছিপরিষদের সদস্য এবং পরে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি। অধুনা স্বর্গগত। এছাড়া কিংকর তপানন্দ মহারাজ এবং ডঃ প্রীতিমাধব রায়। কিছুতেই কোনও জায়গা এবং শোভাযাত্রার অনুমতি দিতে পুলিশ এবং প্রশাসন রাজী নয়। আর মাত্র একদিন বাকী। শেষে দেশলাই বাক্সের সাইজের একটা ছোট্ট জায়গার অনুমতি দিল প্রশাসন ও পুলিশ। ময়দানে টেরিটোরিয়েল আর্মি ইন্সস্টিটিউট-এর পাশে। সেখানেই মঞ্চ হলো। একটাই শোভাযাত্রার অনুমতি পাওয়া গেল। তাও আবার জোড়াবাগান পার্ক থেকে বড়বাজার হয়ে গঙ্গার পাড় ধরে রেডরোড হয়ে ওই মাঠ।

শেষমেশ, প্রশাসনের নির্দেশমতোই জোড়াবাগান থেকে নির্দ্ধারিত পথেই শোভাযাত্রা। হাওড়া, শিয়ালদা থেকে, অন্যান্য জায়গা থেকে রামভক্তরা আসছে তো আসছেই। শেষ হওয়ার নামগন্ধ নেই। বামপন্থী সরকারের দাসানুদাস পুলিশ ভেবেছিল ২/৪ হাজার লোক হবে। জোড়াবাগান পার্ক থেকে শোভাযাত্রা শুরু হলো। সবার সামনে সর্বশ্রী অশোক সিংঘল, ডাঃ সুজিত ধর, গোপলভাই আসর, বালকৃষ্ণ নাইক, বিভিন্ন মঠ, মত-পন্থের সন্তবৃন্দ। পিছনে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সর্বসাধারণ অগণিত রামভক্ত। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেও ভরদুপুরে বেশ কড়া রোদ। তবে পরোয়া নেই। এক অপার্থিব, অনাবিল বাঁধভাঙ্গা আনন্দ মুখর পরিবেশ। একটাই ধ্বনি জয় শ্রীরাম। আর তা বার বার কলকাতার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া মন্দির গড়ার শপথ তো রয়েইছে। যে অযুত-কোটি মানুষের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে। রাস্তায় স্থানে স্থানে জলসত্র। তবে জলসত্র না বলে বলা উচিৎ সরবতসত্র। সরবত পান করাচ্ছেন যিনি তিনিও রামভক্ত, যাঁরা পান করছেন তাঁরাও রামভক্ত। সকলের একটাই পরিচয়—রামভক্ত। রামভক্তি সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছে। পুলিশ হাওড়াতে প্রথম প্রথম লোক গুণতি করছিল। তবে রামভক্তদের সংখ্যাটা শীঘ্রই ৫০ হাজার পার হতে গুণতি করা বন্ধ করে দেয় বলে খবর। আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল বিশাল জনসভার প্রধান বক্তা অশোকজী সিংঘল। ছোট্ট জায়গায় রামভক্তদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। মিছিলের সামনের অংশ যখন সভাস্থলে তখনও শেষ ভাগ যাত্রা শুরু করতে পারেনি।

আগে থেকেই ঠিক ছিল গ্রাম গ্রাম থেকে পূজিত শ্রীরামশিলা ময়দানে তিনদিন থাকবে। পরের দু'দিন মাতৃসম্মেলন ও যুবসম্মেলন হবে সভাস্থলে। পরদিন সকালে যথারীতি যজ্ঞ ও হোম। বাউল গানও ছিল একটু রাত্রির দিকে। গায়ক বাউলসম্রাট পূর্ণচন্দ্র দাস। চারদিকে পাহারা দিচ্ছে নিরেট বাঁশের লাঠি হাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা। তারপর রয়েছে কলকাতা পুলিশ। খুব কায়দা করে একটা গুজব রটানো হয়েছিল নেতা-মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দিয়ে। হঠাৎ শ্রীকলোনীতে সঙেঘর এক কার্যকর্তার বাড়িতে ফোনে খবর এল—হাজি মস্তান কলকাতায়। রামশিলার মিছিল

আক্রান্ত হতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার কর্মকর্তা অসীম গাঙ্গুলী দৌড়ে গেলেন (বর্তমানে শ্রী গাঙ্গুলী দক্ষিণ ভাগ সঙ্ঘচালক) সেই ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবকের বাড়িতে। পুলিশ বাদেও শোভাযাত্রায় নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তৎকালীন প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক তপন কুমার ঘোষ অঘোষিতভাবে সে দায়িত্বে ছিলেন। যুব সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবক্তা উত্তম কুমার দাস (মুর্শিদাবাদ বিভাগ সংগঠন সম্পাদক)। আর মাতৃ সম্মেলনে আশীর্বচন দেন শ্রীশ্রী সত্যানন্দ দেবায়তনের সন্ন্যাসিনী অর্চনাপূরী মা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা তখন প্রায় ২৪ ঘণ্টাই চত্বরে যাতায়াত করছে। একস্থানে স্তূপীকৃত রামশিলা। নির্দিষ্ট কাউন্টারে মন্দির নির্মাণকল্পে অর্থদান চলছে। দানপাত্র উপছে পড়ছে। ঘড়ি ধরে পাহারা চলছে। ৭ নভেম্বর রাত্রিতে সব রামশিলা একটা বড় ট্রাকে বোঝাই করা হলো। সেই ছবি তোলার জন্যও সাংবাদিকদের হুড়োহুড়ি ছিল। সব সড়কপথে যাবে অযোধ্যায়। পুলিশ ছাড়াও বজরং দলের স্বেচ্ছাসেবকরা থাকবে সঙ্গে। ৮ নভেম্বর সকালে বিশাল কনভয়ের যাত্রা শুরু হলো কলকাতা থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। বর্ধমানে দুপুরের ভোজন এবং আসানসোলে রাত্রিবাস। বর্ধমানে দুপুরে যাত্রীদের ভোজনব্যবস্থা ছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যালয়ে। পরে শহরে শোভাযাত্রা করে আসানসোল রওনা হওয়ার কথা। দুপুর থেকেই কানাঘুষো শহর থেকে পুলিশ বের হতেই দেবে না। ১৪৪ ধারা জারি। সম্ভবত, অসীম বর্মন তখন বর্ধমানের জেলাশাসক। সবাই বের হচ্ছে। সামনে একটা ধবস্তাধবস্তির মতো অবস্থা। শহরবাসী যেন বর্ধমানের রাস্তায় নেমে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রামভক্তদের চাপে প্রশাসনকে অনুমতি দিতে হল। রাত্রিতে কনভয় পৌঁছে গেল আসানসোলে। সেখানেও মাতৃশক্তির কাছে প্রশাসনকে হার মানতে হয়েছে। প্রশাসন রাগে ফুঁসছে। পরদিন বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন হয়েছে। রয়েছে সি আই এস এফ। ঠিক যেন যুদ্ধ বেধেছে। পশ্চিমবঙ্গে আই এ এস, আই পি এস অফিসারদের নির্লজ্জভাবে রাজনৈতিক প্রভুদের তোষণের এমন উদাহরণ বোধহয় পৃথিবীজুড়ে মেলা ভার। আসানসোলেও বর্ধমানের মতোই প্রশাসনের একবগ্গা মনোভাব—শোভাযাত্রা হবে না, সকাল থেকেই স্নায়ুর লড়াই। একটু বেলাতে গাড়িতে চড়ে শোভাযাত্রার অনুমতি পাওয়া গেল। তাও মূল সড়ক ধরে নয়, বাইপাস দিয়ে মূল শহরকে বাইপাস করে যেতে হবে। তথাস্তু। তখন দেখা গেল গাড়ির শোভাযাত্রাই বিশাল। প্রায় পিছনে থেকে সামনেটা কত আগে তা ঠাহর করা যায় না। রামভক্তরা গাড়ীর লাইন লাগিয়েছে—দু'চাকা, তিনচাকা, চারচাকা। সবাই মুহূর্তে সামিল। পথে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র বসতির এলাকা—নিয়ামৎপুর। প্রায় হেঁটে যেতে হচ্ছিল। ওখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ৯ নভেম্বর-১৯৮৯ সকাল প্রায় দশটা। একজন বড়মাপের পুলিশকর্তা একটা দামী গাড়ীতে বসে রয়েছেন। তাঁকে কখনও নামতে দেখা যায়নি। ততক্ষণে সকালের কাগজে এবং টেলিফোনে আনন্দ সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে সকলের কাছে। আর তা

রামচন্দ্র পরমহংস

হ'ল—পূর্বনির্দ্ধারিত সময়ে শিলান্যাস-এর নির্ঘণ্ট মেনে নির্দ্ধারিত স্থানেই শিলান্যাস সুসম্পন্ন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সারা দেশের বিশিষ্ট সন্ত-মহাত্মা এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ। মহন্ত অবৈদ্যনাথ মহারাজ, শ্রীমৎ শংকরাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী, সাধবী ঋতাম্ভরা, সন্ন্যাসিনী উমা ভারতী, রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তদানীন্তন সরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রি, মোরোপন্ত পিংলে, শ্রীশচন্দ্র দীক্ষিত, ওঁকার ভাবে এবং আরও অনেকে। প্রথম শিলাস্থাপন করেছিলেন হরিজন কার্যকর্তা কামেশ্বর পাসোয়ান।

রীতিমতো অঘটনই বলা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ওই ঐতিহাসিক দিন ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সাল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিলান্যাসের জন্য চিহ্নিত স্থান সহ রামজন্মভূমি চত্বরকে (২.৭৭ একর) বিতর্কিত বলে ঘোষণা করা হয়। রাতদুপুরে রাজধানীর রাজনীতি সক্রিয় হয়। গভীর রাত্রে (বাংলা মতে ৮ নভেম্বর, '৮৯) এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ বসে। হেলিকপ্টার পাঠিয়ে উড়িয়ে আনা হয় মহন্ত অবৈদ্যনাথকে। হাইকোর্ট রায় দেয়। এলাকার বিতর্কিত শিলান্যাসস্থল অবিতর্কিত। ওখানে শিলান্যাস হতেই পারে। পরের ঘটনা ইতিহাস। ভেঙে গেল বাধার প্রাচীর। একই দিনে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে রচিত হয়েছিল আর এক ইতিহাস—ভাঙল বার্লিন প্রাচীর। দুই জার্মানী সম্মিলিত হলো ওই একই দিনে।

পাষাণ প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে রামরথ যাত্রার রাস্তা সুগম হলো। স্থানাভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রীরামশিলা পূজনের বিবরণ দেওয়া গেল না। কুড়ি বছর আগের ঘটনার অনেক স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে গেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বরের (২০১০) আদালতের রায়ে এক যুগাবসান হয়ে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে দেবীপক্ষের প্রাক্কালে। বোধনের আর দেরী নেই। জয় শ্রীরাম। ২৯ সেপ্টেম্বর যারা ঘোষণা করেছিলেন আদালতের রায় সর্বমান্য—তারা এবার রায় মেনে রামমন্দির নির্মাণে হাত লাগান। দীপাবলীর আলোয় দূরীভূত হোক সব অন্ধকার।

করসেবকপুরমে অশোক সিংঘল

করসেবকের ডায়েরী

নবকুমার ভট্টাচার্য

১২ অক্টোবর ১৯৯০

আমি যাচ্ছি। ওয়েটিং ফোরটি ওয়ান। সাধারণ থ্রি টিয়ার। যদিও আমাকে কেউ যাবার নির্দেশ দেয়নি। আমার এই যাবার মধ্যে কোনও নাটুকেপনা নেই। আবার নিছক টাইমপাস করার মতো তুচ্ছ কিছু সময় সরযূর জলে বইয়ে দিতেও আমি যাচ্ছি না। তবে কি আমার ভেতরকার কোনও টান? যা আমাকে টানছে? কিন্তু এই টানতো কেবল আমার একার নয়। অশোক, পবন, গুরু, বাসুদেবের মতো হাজার হাজার লোক যাচ্ছে তবে কিসের টানে? আমি কেন যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আমার কি হবে আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমি চলেছি। কলকাতায় এক বৈঠকে বিষ্ণুজী বলেছিলেন, প্রভুর ডাকে সবাইকে যেতে হবে। অনেকে ভয় পেয়ে চলে গেল। বিষ্ণুজী বলেছিলেন, অন্ধকারের পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হয় পরম জ্যোতির সন্ধানে। সত্যিই তো উজানে উঠে গেলে কিছুই হারাতে হয় না, ভাটিতে এসে দেখা যায় তারই আলো জ্বলছে সর্বত্র। 'তমেবৈকং জানথ, অন্যা বাচো বিমুঞ্চ থ, অমৃতস্য এষ সেতুঃ।' আমার এই অমৃতের পথে যাওয়ার সেতু রচনা করে দিলেন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। করসেবা শব্দের সঠিক অর্থ বুঝি না, তবু হৃদয়ের মাঝে শুনতে পাচ্ছি প্রভুরামচন্দ্রের ধ্বনি 'কে যাবি পারে, ওগো তোরা কে—আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।'

১৮ অক্টোবর ১৯৯০

এই মুহূর্তে কলকাতার কেউ জানে না আমি কোথায় চলেছি। একসঙ্গে সকলে মিলে যাওয়াও যাচ্ছে না কারণ গন্তব্য অযোধ্যা জানলেই পুলিশ ধরবে। তাই কারও সঙ্গে কারোর সম্পর্ক নেই। টিকিট কাটা রয়েছে বেনারস পর্যন্ত। তাতেও হাওড়া স্টেশনে পুলিশের অনুসন্ধান এড়ানো সম্ভব হলো না। অনেক কৌশলে তবে মুক্তি পাওয়া গেল এবং প্রভুর কৃপায় বসার জন্য সিটও মিলল। দূর থেকে ভেসে আসছে ভজনের সুর—। প্রভুজি! তুম চন্দন হম পানি। জাকি অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানি'। রুহিদাস লিখেছেন, তুমি চন্দন আমি বারি। জলের প্রতি অণু পরমাণুতে অঙ্গে অঙ্গে, চন্দনের সুরভি ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। আরও লিখেছেন—তুমি মেঘ আমি ময়ূর, তুমি চাঁদ আমি চকোর, তুমি দীপ আমি বাতি, তুমি মোতি আমি সুতো, তুমি সোনা আমি সোহাগা, তুমি স্বামী আমি দাস। এমনি অনন্ত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। সত্যিই কি!

২০ অক্টোবর ১৯৯০

বেনারস পর্যন্ত ট্রেন আসেনি। মোগলসরাই-এর আগে থেকেই ট্রেনের যাত্রা বন্ধ। হেঁটেই আসতে হয়েছে কিছু পথ। আশ্রয় মিলেছে হজাকোটরায় পণ্ডিত বাসুদেব দ্বিবেদী শাস্ত্রীর বাড়ীতে। এখানেই ঠিক হলো কাল রাতে আমাদের কয়েকজনকে বাইকে করে এলাহাবাদ পৌঁছে দেওয়া হবে। পণ্ডিতজীও সঙ্গে যাবেন করসেবার জন্য। পণ্ডিতজী রামমন্ত্রে দীক্ষিত। রামঅন্ত প্রাণ পণ্ডিতজী বললেন, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র রামচন্দ্র। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞও। শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে তিনি মেলাতে পেরেছিলেন। যদিও রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের কাছে দুঃসহ হলেও রামচন্দ্রের আজীবন এক পত্নীত্ব কতো বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটা আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত। যে সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হলো, ছাড়তে হলো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামচরিত্রের আসল বৈশিষ্ট। যে রাজ্য নিয়ে অত বড় কুরুক্ষেত্র ঘটে গেলো, সে রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? যে মুহূর্তে সব পেলেন সে মুহূর্তে সব ছাড়লেন তাঁরা। বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে যখনই জয় হলো, রামও তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কর্মে তোমার অধিকার কিন্তু ফলে নয়। রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধ কে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে এজন্যই। তা না হলে লোভীর সঙ্গে লোভীর যেসব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ধরে ঘটে

করসেবায় পুলিশের বাধা। সামনের সারিতে শরদ কোঠারী।

আসছে, তার সঙ্গে এসবের প্রভেদ থাকতো না। কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে—আর তাই তার শেষফল চিত্তশুদ্ধি। রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। তাই জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় সুখে এবং দুঃখে সম্পদে এবং সংকটে সে ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্য, অক্লিষ্টকর্ম, শান্ত, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত।

মনে মনে ভাবলাম, বালীর মৃত্যুশয্যায় রাম নিজের সমর্থনে যে চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হোত যদি না তার একথাটি থাকতো ঃ 'তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করিনি, বধ করে আমার মনস্তাপও হয়নি। এই পবিত্র অপার্থিবতা এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালুম যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এ রণ পরিশ্রম-এ তোমার জন্য করা হয়নি। রাম অবতার হলেও মানুষ। নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি বিশেষ কোনও একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের সর্বকালের।

দেহধারী মানুষ হয়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হয়ে যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তাই। তাই তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে বালী-হত্যার হীনতা, সীতা বর্জনের কলঙ্ক, শম্বুক বধের অপরাধ। যদি এসব না ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না করতেন, তবে তাঁর জন্ম সার্থক হোত না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত। অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম বলে মনে করতে পারতাম না।

২৬ অক্টোবর, ১৯৯০

আমরা চলেছি অযোধ্যার দিকে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে। এ পর্যন্ত কোনও বাধা আসেনি। পণ্ডিতজী বললেন, মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয় নিঃসম্বল অবস্থায়। তবেই তাঁর উপর ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসে। একমাত্র প্রভু রামচন্দ্রের শরণাগতি ছাড়া অযোধ্যায় যাবার উপায় নেই। খবর পাচ্ছি অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ এখন দুঃস্বপ্নের নগরী। উত্তরপ্রদেশের সব মানুষ এখন অভিশাপ দিচ্ছেন মুলায়মকে। রাস্তায় যত গোরু মোষ কুকুর দেখছি তাদের প্রায় সবার গায়েই লেখা হয়েছে 'মৌলানা মুলায়ম'। গ্রামের ঘরে ঘরে 'জয় শ্রীরাম' স্টিকার সাঁটা। আজ সকালে এক রামভক্ত যত্ন সহকারে ভোজন করিয়েছেন আমাদের। পথ চলতে চলতেই খবর পেলাম আজ দুপুরে রাম জন্মভূমি ইস্যুতে চলন্ত ট্রেনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথম 'শহিদ' হয়েছেন সাহারাণপুরের মন্দির গ্রামের বাসিন্দা পুরণ চাঁদ বর্মা। গ্রামের মানুষ আমাদের করসেবকদের প্রতিপদে সাহায্য না করলে আমরা যেতে পারতাম না। সন্ধ্যায় একটি বাড়ীতে আশ্রয় মিলল। তিনি বেদনারায়ণ ওঝা। গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আজ তাঁর বাড়ীতে কিছু অতিথি আসবেন তাই আমাদেরও থেকে যেতে বললেন। পরে শোনা গেল অতিথি হিসেবে যারা আসছেন সবাই ওঝাজীর আত্মীয় এবং তারাও রামভক্ত। সবাই অযোধ্যায় যাবেন। তার দুই পুত্র, একমেয়ে। ভাই ভাইপো সবাই করসেবা করতে চলে গেছেন। কেবল তিনি তার স্ত্রী ও ভাইবৌ বাড়ীতে রয়েছেন। ওঝাজীর করসেবায় না যাওয়ার কারণ জানা গেল গ্রামের মুলায়ম -পন্থী সরপঞ্চ হুমকি দিয়েছেন তিনি করসেবায় গেলে তার চাকরি রদ করে দেওয়া হবে। তাই ছাপোষা ধার্মিক নিরীহ বেদনারায়ণ ওঝা নিজে করসেবা না করলেও তার প্রায় পঞ্চাশজন আত্মীয়কে উদ্বুদ্ধ করেছেন করসেবায় যোগ দিতে। মনে মনে ভাবলাম—পবিত্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাই হয়তো বলেছেন, 'ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।'

২৮ অক্টোবর ১৯৯০

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে অন্য সমালোচনার আদর্শে বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে—যুগযুগ ধরে ভারতীয় মনে তাঁর কোনও মূর্তিটি গড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তাও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। রাম বালীবধ করে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ বধ করে বিভীষণকে। কোন রাজত্বই নিজে নিলেন না, মিতালি করলেন চণ্ডালের সঙ্গে, বানরের সঙ্গে এই উপায়ে অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ সকলের মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন। ভারতীয় ইতিহাসে সম্ভবত প্রথমতম সেই ঐক্যসাধন। রামের কল্পনায় ভারতের ঐক্য ও সংহতির আদর্শ ছিল। সোমনাথ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সবখানেই তাই রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ। পায়ে পায়ে সারা ভারতের মানুষ চলেছে অযোধ্যায়। সারা ভারতের দৃষ্টি অযোধ্যার দিকে। আমরা এসে পৌঁছেছি ফৈজাবাদে। অযোধ্যা আর মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে। ফৈজাবাদের নাকা মাজাফুরা অঞ্চলে এসে দেখা হলো বহু করসেবকের সঙ্গে। শুনলাম পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে এখানে এসেছেন তাঁরা সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। এদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। বিজয়ওয়াড়া থেকে আসা ডাঃ ভাস্কর রেড্ডি র সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁর কথায়—আমরা ভাল হিন্দি জানি না। তবে ভাষা নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যাই হয়নি। গ্রামের মানুষ ও পুলিশরা আমাদের প্রতিপদে সাহায্য করেছেন। মনে পড়ল স্বামী অদ্ভুতানন্দের লেখা—'যেখানে রাম, সেখানে আরাম শান্তি। যেখানে রাম নেই, সেখানে আরামও নেই। মানুষের যখন ভক্তি হয়, তখন সে দেবতা হয়ে যায়, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার—এসব তার কিছুই থাকে না।' রবীন্দ্রনাথের কথায়—'ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে তাহা নহে।'

২৯ অক্টোবর ১৯৯০

আজকের অভিজ্ঞতা—রীতিমত রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। রাত এগারোটা নাগাদ একদল করসেবকদের সঙ্গে পৌঁছালাম সরযূনদীর তীরে। বেশ ঠাণ্ডা। ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিলেন কলপি বাবা। চিমটে বাজিয়ে রামধুন গাইছিলেন আরও কয়েকজন সাধু। প্রণাম করতেই বাবার ঘোষণা, 'কাল রাত (সোমবার) বারহ বজে তক কাল যুগকা তারা গির জায়েগা'। অর্থাৎ সোমবার মাঝরাত থেকেই শুরু হবে অপারেশন—করসেবা। সেই করসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকা থেকে আসা করসেবকরা। একেবারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অযোধ্যায় ঢুকেছে তারা। এসেছে মহিলারাও। রাতের অন্ধকারে গোপন রাস্তা ধরে এসেছে এইসব জাঠা। মহিলাদের জাঠার নাম কৌশল্যা জাঠা, সীতা জাঠা, রাজমাতা জাঠা। জাঠার নেতার কাছে রয়েছে রুট ম্যাপ।

৩০ অক্টোবর ১৯৯০

হিন্দুত্বের এই বিস্ফোরণ কেন? খোলামন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে ভাবা দরকার ভারতীয় রাজনীতি আজ রামনামের দোলায় দুলছে কেন? বস্তুত তুলসীদাস ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দুর বুকের মাঝখানটিতে রামচন্দ্রকে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। রাজনীতি করতে আসার প্রথমপর্বে মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন। 'হিন্দবী স্বরাজ' নামে একটি চটি বই। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মূল যোগসূত্র কোথায় এবং তার স্বরূপ খুঁজতে গেলেই বইটি প্রয়োজন। তাঁর রামগান—'রঘুপতি রাঘব রাজারাম —পতিত পাবন সীতারাম' প্রতিটি ঘরে বন্দনা পেয়েছিল। তিনি রামরাজ্য গড়ার কথা বলেছিলেন। অযোধ্যায় আজ আরও কয়েকটি চেকপোস্ট করা হয়েছে। সাধারণভাবে রামমন্দির ত্রিসীমার মধ্যে কারও ঢোকার জো নেই। তবু প্রভুর কাছে সকলের যাওয়ার ইচ্ছা, প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন। স্বামীজীর কথায়—ব্যাকুলতা যত বাড়বে ততই তাঁর কৃপা সন্নিকট হবে। তাঁর কৃপাই তাঁকে লাভ করার উপায়। কিন্তু সকলে সে কৃপা পেল না। অত্যাচারী মুলায়মের পুলিশ আজ সরযূ নদীর সেতুর ওপরে নির্বিচারে গুলি চালালো। মারা গেল কয়েকশো করসেবক। 'মৃত্যু যদিও স্থান কাল বিচার করে না, তার সময় হলেই হাজির হয়', তবুও এই করসেবকরা অমর হয়ে রইলেন। ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরের নামই তো মুক্তি। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, 'তাঁর (শ্রীভগবানের) যুগধর্ম সংস্থাপনের কাজ কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্য আটকায় না।' তাই করসেবা বন্ধ করা যায়নি।

৩ নভেম্বর, ১৯৯০

আজও অযোধ্যায় গুলি চলেছে। গুলিতে কম করেও ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারিভাবে অবশ্য বলা হচ্ছে, মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র ১৬ কিন্তু আমার পক্ষে এই সংখ্যা মানা মুশকিল। উল্লেখযোগ্য হলো, আজকের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দুজন কলকাতার রয়েছে। হনুমানগড়ির সামনে একটি বাড়ির ছাদ থেকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও সি আর পি-র এক পুলিশের অনেক অপকর্ম আমি দেখেছি। সি আর পি-র দুই পাঞ্জাবী শিখ ইন্সপেক্টর পরমবীর সিং ও জে এস ভাল্লার যেভাবে করসেবকদের গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল তা লজ্জাজনক। পরমহংস রামদাসজির দিগম্বর আখড়ায় ঢুকেও গুলি চালায় পুলিশ। সাধুরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেও গুলি চালাতে লজ্জাবোধ করেনি পুলিশ। নিরস্ত্র করসেবকদের মাথার খুলি গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। করসেবকদের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ তে। সেদিন অযোধ্যার আকাশ বাতাসে একটাই স্লোগান মুখরিত ছিল 'জয় শ্রীরাম, হোগয়া কাম'। ৯০তে যা ছিল রোমহর্ষক ৯২তে তা ছিল রোমাঞ্চ ক। আদর্শ ঠিক থাকলে, মনে এই জোর থাকলে ধর্মপথ হতে কেউ কাউকে বিচলিত করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ তাহা বিশ্ব সাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে।'

রাম কোঠারী ও শরৎ কোঠারী।

একবার বিদায় দে মা

তন্ময় নাগ

বাইশে অক্টোবরের রাত, ১৯৯০ সাল। হাওড়া স্টেশন চত্বরে জড়ো হয়েছেন করসেবকরা। কালকা মেলে রওনা হবেন তাঁরা। প্রদীপ গুপ্তার নেতৃত্বে বড়বাজার এলাকার করসেবকদের বাহিনীতে সংখ্যা হবে প্রায় একশো'। বেশির ভাগই তরুণ। প্রাণ চাঞ্চ ল্যে ভরপুর। শ্রীরামমন্দির নির্মাণে আত্মনিবেদনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কপালে তিলক। বুকে ব্যাজ, বজরঙ্গ দলের। কণ্ঠে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি, পুরো প্ল্যাটফর্মের চেহারাটাই সেদিন গিয়েছিল পাল্টে। করসেবকদের অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁদের আত্মীয়-বন্ধু, ভাই-বোন, মা-বাবা। এসেছিলেন হীরালাল কোঠারীও। হীরালালবাবু কলকাতায় মাহেশ্বরী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শেয়ার-মার্কেটে ব্যবসাও আছে। দুই ছেলেও তাঁর কাজে সাহায্য করে। তাঁর সেই দুই ছেলে রামকুমার আর শরৎ অযোধ্যায় করসেবা করতে যাচ্ছে। বড় আনন্দের দিন। ওদের মাকে নিয়েই তাই তিনি সেদিন হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন। কিন্তু তখন কি আর জানতেন ছেলেদের সঙ্গে তাদের সেই শেষ দেখা। দু'ভায়ের পুরো নাম রামকুমার কোঠারী আর শরৎকুমার কোঠারী। দুই ভাই, এক বোন। রামকুমারের বয়স তেইশ আর শরতের বিশ। কলকাতার উমেশচন্দ্র কলেজ থেকে রামকুমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আর শরৎ ছিলেন ওই কলেজেরই বি কম-এর ছাত্র। দু'জনেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। রামকুমার জোড়াবাগান পার্কের

মাহেশ সায়ম শাখার কার্যবাহ। শরৎ তারাসুন্দরী পার্কের বিক্রম সায়ম শাখার মুখ্য-শিক্ষক। আগে তাঁরা থাকতেন কলকাতার বি কে পাল অ্যাভিনিউ-তে। এখন তাঁদের বাড়ি হাওড়ার বালি ঘোষপাড়ায়। (স্বস্তিকা ১২ নভেম্বর, ১৯৯০)।

রাম কুমার কোঠারী এবং শরৎ কুমার কোঠারী রাম-মন্দির আন্দোলনের দুই অমর শহীদের নাম। আত্মবলিদানের দুই দশক বাদে এঁরা রাম-শরৎ নামেই একটা কল্পলোকের শহীদ স্তম্ভ যেন আপনা থেকেই স্থাপনা করে ফেলেছেন। প্রতিদিন যাতে অজস্র রজনীগন্ধার ছোঁয়া। অনুভব করা যায়, তবু অধরা। সেই কোন্ ছোটবেলায় ছেলে শরতের মুখে ক্ষুদিরামের ফাঁসিলাঞ্ছিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' শুনে অজান্তেই কেঁপে উঠত মা সুমিত্রা কোঠারীর হৃদয়। স্বামী হীরালালবাবু ভাল বাংলা ভাষা জানলেও কিংবা শরৎ বরাবরই বাংলা গান ভাল গাইলেও তখনও অবধি বাংলাভাষায় ততটা সড়গড় না হওয়া সুমিত্রা কোঠারীর শরতের গাওয়া গানটার মানে বুঝতে কষ্ট হয়নি। এই প্রতিবেদককে জানালেন, 'কতবার বলেছি আমার সামনে তুই এই গানটা গাইবি না; আমার ভাল লাগে না। ও খালি হাসতো।' স্বস্তিকা-র ১২ নভেম্বর সংখ্যায় যখন উপরোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় তার দশদিন আগেই শহীদ হয়েছেন রাম-শরৎ। রাম-শরতের স্মৃতি তর্পণের পাশাপাশি স্বস্তিকার তৎকালীন প্রতিবেদক একটি মূল্যবান তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন। আরেক করসেবক শম্ভুনাথ ধাড়া-কে উদ্ধৃত করে সেই প্রতিবেদক জানিয়েছেন—৩০ অক্টোবর, ১৯৯০ যাঁরা অযোধ্যার 'বিতর্কিত স্থান' (যদিও এবছর ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের রায়ের পর সে জমি আর 'বিতর্কিত' নয়, একান্তভাবেই রামলালার)-এর গম্বুজের ওপর গৈরিক পতাকা লাগিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন এই কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ও। এ-প্রসঙ্গে ২৬ নভেম্বর, ১৯৯০ সালের স্বস্তিকায় প্রকাশিত শম্ভু ধাড়ার প্রতিবেদন একটি নির্ভরযোগ্য দলিল। এ-তথ্যে পরে আসা যাবে।

তার আগে ২রা নভেম্বর রাম-শরতের আত্মবলিদান নিয়ে দৈনিক বর্তমানে একটি মর্মান্তিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার দিন ৩ নভেম্বর, ১৯৯০ সাল। শীর্ষক ছিল—"রামদাসজীর আখড়ায় ঢুকেও হত্যা করা হলো সাধুদের। অযোধ্যায় পুলিশের তাণ্ডব, গুলিতে ৩০ জন করসেবক হত।" তখন উত্তরপ্রদেশে শাসন-ক্ষমতায় ছিলেন মুলায়ম সিং যাদব। তার পেটোয়া পুলিশ করসেবার জন্য যাওয়া স্বয়ংসেবকদের প্রতি এত নৃশংস ও বর্বরোচিত অত্যাচার করেছিল যে বিশ্ব অত্যাচারের ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। সম্ভবত চেচেস্কু আর স্ট্যালিনের অত্যাচারের সামগ্রিক পরিমাপও এর কাছে হার মানবে! প্রতিবেদনটি এরকম—"দু'দিন পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত থাকার পর অযোধ্যায় আজ (২ নভেম্বর, ১৯৯০) আবার হাঙ্গামা হয়েছে। বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কয়েক হাজার করসেবক আজ আবার বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি চত্বরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কিন্তু করসেবকদের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হওয়ায় সি আর পি বাহিনী গুলি চালায়। গুলিতে কম করেও ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা প্রায় একশো। সরকারিভাবে অবশ্য বলা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা মাত্র ১৬। কিন্তু আমরা যারা হনুমানগড়ির সামনে একটি বাড়ির ছাদ থেকে এই সংঘর্ষ দেখেছি তাদের পক্ষে এই সংখ্যা মানা মুশকিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, আজকের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দু'জন কলকাতার লোকও আছেন। এঁরা হলেন রামকুমার কোঠারী, শরৎকুমার কোঠারী; দুই ভাই। বাড়ি হাওড়া জেলার বালি ঘোষপাড়ায়। দু'জনেই বারাণসী থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যায় এসেছিল। এই দু'ভাইয়ের মৃতদেহ রাত পর্যন্ত রাখা ছিল মণিরাম ছাউনিতে। পুলিশের তাড়া খেয়ে শরৎকুমার কোঠারী যখন পালাচ্ছিল একটি গলির মুখে পুলিশের লাঠি এসে পড়ে তার মাথায়। লাঠির ঘা খেয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সি আর পি এফ জওয়ান তার মাথার খুলি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ভাইকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখে রামকুমার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর দ্বিতীয় গুলিটি লাগে রামকুমারের পিঠে। দু'জনেরই মৃত্যু হয়, ঘটনাস্থলেই।" এনিয়ে হীরালাল কোঠারীর সাক্ষ্য—"গত বছর (১৯৮৯) রামশিলা পুজোর সময় থেকেই দু'ভাই একাজে লেগে পড়েছিল। যত দিন গেছে, ততই ওদের রোখ বেড়েছে। কেন ওরা মন্দির করতে দেবে না? যদি না দেয় তবে আমরাই করবো। ২২ অক্টোবর (১৯৯০) ওরা রওনা দেয়। প্রথমে বেনারস নামে। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে যায় আজমগড়ে। তারপর ২০০ কি.মি. হেঁটে অযোধ্যা পৌঁছোয়। মাঝে মধ্যেই টেলিফোন করে ওরা বাড়িতে এসব জানিয়েছে।"

২ নভেম্বর, ১৯৯০-এর সেই ভয়াবহ দিনের কথা উঠে এসেছে প্রত্যক্ষদর্শী শম্ভুনাথ ধাড়ার প্রতিবেদনে। তিনি লিখছেন,—"১ নভেম্বর অশোকজী (সিংঘল) প্রান্ত প্রমুখদের বৈঠকে ঘোষণা করলেন ২ তারিখ সকাল ৯টায় আবার মন্দিরে করসেবার জন্য দু'দিক দিয়ে এগোতে হবে। অধ্যাপক রাম অবতার বর্মার নেতৃত্বে বড়াভক্তামাল হয়ে যে দলটি হনুমানগড়ির দিকে গেল সেই দলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের করসেবকরা ছিলাম। আবার শুরু হলো প্রবল লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া। লাঠির আঘাতে অনেকেরই মাথা ফেটে তখন রক্ত ঝরছে। সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। পরক্ষণেই গুলির আওয়াজ। সামনেই পাঁচ-সাতজন লুটিয়ে পড়লো। কয়েকজনের সঙ্গে চৌরাস্তার পাশে একটা দোকানে আমরা আশ্রয় নিলাম। পুলিশ সেখানে এসেও পেটাতে শুরু করলো। আবার দৌড়াই। মারমুখী উন্মত্ত পুলিশও দৌড়োচ্ছে। অবশেষে একটা বাড়িতে ঢুকলাম। এক ভদ্রমহিলা মই এগিয়ে দিলেন। মই বেয়ে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদ হয়ে পাশের একটা গলির মধ্যে আমরা কয়েকজন ঢুকে পড়ি। প্রায় ১০ মিনিট ধরে একনাগাড়ে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। মণিলাল কি ছাউনি-তে এসে দেখি বহু রামভক্তের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে। পশ্চিমবাংলার দুই শহীদ রামকুমার ও শরৎ কোঠারীর দেহ সেখানেই ছিল। বারবার মনে পড়ছিল সেদিন সকালেই রাম পকেট থেকে একটা গৈরিক ফেট্টি বার করে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, খালি মাথায় শম্ভুদা ভাল লাগে না। শরতের মুখে সবসময় লেগে থাকতো 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান।"

অযোধ্যায় করসেবার জন্য গঠিত যে গটে (গ্রুপ) কোঠারী ভাইয়েরা ছিলেন, সেই গটেরই সদস্য রাজেশের সংযোজন—"২ নভেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, শরৎ গুণগুণ করে আপন মনে গাইছে—'জাগো রে জাগো রে জাগো হিন্দু'। আজ কিছু করবো—এরকম একটা সংকল্প। পথে একটা দোকান থেকে পট্টি কিনে নিয়ে বলল, এতে লিখব 'কফন'। তারপর পট্টিটা মাথায় বেঁধে নিল।" (স্বস্তিকা ১৯/১১/১৯৯০)। পুলিশি বর্বরতা আর নৃশংসতার মুখে রাম-শরৎ সহ জনা পঁচিশেক স্বয়ংসেবক যে ডঃ কৃষ্ণচন্দ্রাচার্য শাস্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই বাড়ির গৃহিণী শ্রীমতি শাস্ত্রীর বেদনাবিধুর স্মৃতিচারণ—"সেদিন (২ নভেম্বর, ১৯৯০) পুলিশ ছাদের ওপর দিয়ে এসে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকল। আমাদের (শাস্ত্রী দম্পতি) একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে ১১ জন করসেবককে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে কুকুরের মতো গুলি করে। এসবই দেখি ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে। বাড়ির ভেতরে ও পাশের গলিতে নিহত করসেবকদের রক্তের দাগ দেখলাম। স্পর্শ করে প্রণাম করলাম।" দিল্লীর সরকার আর উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং-এর শত-সহস্র অত্যাচারের স্পর্ধা সেদিন রাম-শরতের যৌবন জলতরঙ্গকে রুধিতে পারেনি। তাই আর এস এসের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের তৎকালীন কার্যবাহ সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল—"অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে বোঝা গেল—কংগ্রেস নয়, জনতা নয় আমাদের সবার একটাই পরিচয়—হিন্দু।"

সোমনাথ থেকে অযোধ্যা – আদবানীর রামরথ যাত্রা।

রাম-শরতের অন্ত্যেষ্টির একটি সমাচার ৫ নভেম্বর ১৯৯০-এর বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমাচারটি সমকালীন সময়ের দর্পণ। তাতে লেখা হয়—"রবিবার দুপুরে সরযূ নদীর তীরে শেষকৃত্য হলো বাংলার দুই ছেলে রামকুমার কোঠারী এবং শরৎকুমার কোঠারীর। হাওড়ার বালি থেকে করসেবায় অংশ নিতে আসা কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয় গত ২ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল অযোধ্যার রাস্তায়। রামকুমারের মাথা এবং শরৎকুমারের পিঠ ভেদ করে চলে গেছিল সি আর পি এফের গুলি। চিতায় আগুন যখন জ্বলছে সরযূর তীরে অসংখ্য করসেবক দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে কেউ কেউ নীচু স্বরে বলছিলেন, এই দুই ভাই-ই প্রথম ৩০ তারিখে বাবরি মসজিদের মাথায় উঠে গৈরিক পতাকা তুলে দিয়েছিল। কোঠারী ভাইদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য বালি থেকে আজ দুপুরেই ছুটে এসেছেন শরৎ ও রামকুমারের জ্যাঠা দাউলাল। স্টক এক্সচেঞ্জের পারিবারিক ব্যবসা দাউলালের। শ্মশানে দাঁড়িয়েই দাউলাল জানালেন, আর ১৩ দিন বাদেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল রামকুমারের। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। জবাফুলের মতো রক্তলাল চোখ নিয়ে তিনি আরও বললেন, নিহত দু'ভাই আর এস এসের সক্রিয় কর্মী ছিল। সবার আগে বাবাকে প্রণাম করে বলেছিল, রামমন্দির না করে আমরা ফিরব না। এটাই আমাদের শেষ দেখা। ৩০ তারিখে (মুলায়ম সরকারের দমননীতি ও বর্বরতাকে উপেক্ষা করে অযোধ্যায় করসেবকদের প্রবেশের দিন) কোঠারী ভাইয়েরা বালির বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছিল তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একটু থেমে দাউলাল আরও বললেন, ওদের জন্য আজ আমাদের গোটা পরিবার গর্বিত। জ্বলন্ত চিতার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলকাতা পুরসভার বিজেপি সদস্য শান্তিলাল জৈন। কাছেই ছিলেন দলের উত্তর-পশ্চিম কলকাতার জেলা সম্পাদক হরিকিশোর ট্যান্ডন। ট্যান্ডন জানালেন, ২ তারিখে করসেবায় যাওয়ার আগে ওঁরা আমার হাতে ৯০০ টাকা তুলে দিয়ে বলেছিল, জান কবুল করে যাচ্ছি। এই টাকাটা আপনার কাছে রেখে দিন। সত্যি ওরা শেষ পর্যন্ত ফিরলো না।" অশোক সিংঘল বলেছিলেন—"বাংলার শহীদী পরম্পরার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো রাম কোঠারী-শরৎ কোঠারী।"

হীরালাল কোঠারী গত হয়েছেন, আজ প্রায় আট বছর হলো। বালির বাড়ি ছেড়ে কলকাতার বড়বাজারেই একটি বাড়িতে মেয়ে পূর্ণিমা আর তার দশ বছরের কন্যাকে নিয়ে দুই পুত্র ও স্বামীর স্মৃতি আগলে রয়েছেন হীরালালজায়া পুত্রধনে অভিমানী 'বীরমাতা' সম্মানে ভূষিতা সুমিত্রা। সুপ্রিম কোর্ট যেদিন (২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০) রায় দিল যে আগামী ৩০ তারিখ অযোধ্যা মামলার রায় দেবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ , সেদিন সারাদিন ধরে নাতনি যশস্বীনী-কে (কন্যা পূর্ণিমার মেয়ে) তার মামাদের (রাম-শরৎ) গল্প করেছেন সুমিত্রা কোঠারী। আর ৩০ তারিখ চূড়ান্ত রায়ের পরে তাঁর চোখে আনন্দাশ্রুর প্লাবন। স্বামীর কথাটাই কানে বাজছে—'মন্দির জরুর বনে। হিন্দুরাষ্ট্র কা স্থাপনা হো। এহি প্রার্থনা।'

Part III
Fundamental Rights
General

ভারতের সংবিধানে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের চিত্র।

শ্রীরামচন্দ্র এক ঐতিহাসিক ও ন্যায়ালয় স্বীকৃত সত্ত্বা

ডাঃ প্রবীন তোগাড়িয়া

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ভগবান রামলালা তাঁর নিজের জন্মভূমির ওপর অধিকার কায়েম করার পরও, এমনকী সেই জন্মভূমিটি (আদালতের রায়ে যা 'স্থান' বলে বর্ণিত) নিজেই একজন বিচার্য সত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের এবং ভগবান রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বর্তমানে প্রচলিত ধারা অনুযায়ীই ষড়যন্ত্র চলছে। এতে ভগবান রামচন্দ্রকে একদিকে যেমন অসম্মান করা হলো; তেমনি অন্যদিকে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে চলে আসা একটি মামলার রায়, সেইসঙ্গে প্রাজ্ঞ বিচারপতিদের যুক্তি, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারকদের এই

রায়দান নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন, এমনকী বিজ্ঞানসম্মত এবং কারিগরী দিক দিয়ে উন্নতমানের সমীক্ষা, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া (এ. এস. আই.)-র প্রতিবেদন— যার বিষয়বস্তুগুলো অত্যাধুনিক ভূ-র‍্যাডার এবং অন্যান্য যথোপযোগী যন্ত্রের মাধ্যমে বাবরের অন্তরঙ্গ বন্ধুর তৈরি করা কাঠামোর নীচে আদতে কি রয়েছে তার অনুধাবনের চেষ্টা—এই সবকিছুরই নিন্দা ও বিদ্রূপ করা হলো।

এরপরও বিভিন্ন সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং খবরের কাগজ থেকে শুরু করে অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন নানাধরনের ওয়েব স্পেস ও সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট সবেতেই মহাপণ্ডিতগণ এবং তথাকথিত নিয়মিত স্তম্ভলেখকরা বাতানুকুল স্টুডিওতে বসে কিংবা খবরের কাগজে লিখে নিয়মমাফিক সর্বোচ্চ কক্ষে বসে (কিংবা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে) থেকে জানান দিচ্ছিলেন রামজন্মভূমি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় হিন্দু বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, আইনের ওপর নয়। প্রাথমিকভাবে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন এইসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা লিখে কি-ই বা হবে, তার চাইতে এরকম তথাকথিত টেলিভিশন তার্কিক, সঞ্চালক, স্তম্ভলেখক এবং অন্যান্যদের এব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলাই শ্রেয়। যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে ও ঘটনায় বিগত ৮ বছরে বহুবার দেখা গিয়েছে। কিন্তু যত সময় গড়াল আমরা তত অনুভব করলাম, দীর্ঘদিনের উপেক্ষার স্বরূপ কেমন হতে পারে, যার দ্বারা ভগবান রাম ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগতভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিন চ্যানেলের উপরতলা থেকে আসা ও খবরের কাগজগুলোয় বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধের মাধ্যমে উঠে আসা কণ্ঠস্বরের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের বিচার-ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে বিচারপতিরা ভগবান রাম ও হিন্দু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পরবর্তী রায় দেন। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ হাইকোর্টের রায়ের বহু পূর্বেই অবশ্য রাম ও হিন্দু-বিরোধী এহেন কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবাই লক্ষ্য করেছেন রায় দানের বহু পূর্বেই এ নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে বিভ্রান্তিমূলক বিতর্ক চালানো হয়েছে এবং সংবাদপত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রবন্ধ লিখে বিচার-বিভাগকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা হয়েছে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে বিজ্ঞানপনটি দিয়েছিলেন তার দিকে খেয়াল করুন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই বিজ্ঞাপনে ঠিক যেন আবেদনের মতো করে তিনি বলেছিলেন—আগত রায়-ই চূড়ান্ত নয়। এমনকী আমাদের প্রাজ্ঞ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত দেরী হওয়া বিচারের রায়দানের আগেই অন্তিম পর্যায়ে এসে বলে বসলেন, এতে কেউ জিতবে না, কেউ হারবে না। সুতরাং এটা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে এইসব সক্রিয়তার মাধ্যমে তাঁরা যে আসলে বিচারবিভাগীয় কাজে নাক গলানোর চেষ্টা করছেন এবং তা তাঁরা জানতেন না।

কে, কি করেছিল এবং কেন করেছিল—এটাই আসল বিচার্য নয়। প্রধান বিচার্য হলো, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এমনকী স্বাধীনতার আগেও জাতির উন্নতিতে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের প্রতি একপ্রকার বিদ্বেষী মনোভাব নিয়েই 'হিন্দু বিশ্বাস'কে প্রকারান্তরে অপমানিত করা হয়েছে যেখানে 'ইসলামী বিশ্বাস'কে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মোড়কে সযত্নে লালন-পালন করে বাড়তে সাহায্য করা হয়েছে। কোনও একটি ধর্ম কিভাবে অন্যের চাইতে আরও সমকক্ষ হতে পারে, বিশেষ করে এই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সেই চেষ্টা চলছে। তবুও কি জন্য একে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে আখ্যায়িত করা হবে?

এক ধরনের অমায়িকতা, যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মিডিয়াও এটাকে খুব ভালভাবে ম্যানেজ করেছে, সেইসাথে কিছু সামাজিক মঞ্চ ও এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে বলতে শুরু করেছে এটা হলো 'বিশ্বাস বনাম আইন'-এর লড়াই। এর পেছনে রয়েছে একটা আন্তর্জাতিক খেলা, কায়েমী স্বার্থের তাগিদে ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি এই খেলা খেলছে আর তাদের মদত দিচ্ছে ভোট-লোভী রাজনীতিক এবং তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' (অভিধানে এই শব্দটির মানে যা-ই হোক না কেন, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের কাছে এর অর্থ-হিন্দু-বিরোধিতা এবং মুসলিম পন্থা অনুসরণ করা) সংবাদমাধ্যম।

এইসব হিন্দু-বিদ্বেষীরা উপরোক্ত রায় সম্পর্কে এমন একটা ছবি তুলে ধরতে চাইছে যাতে করে মনে হয় ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দু বিশ্বাস বাদ দিয়ে বাকি সব মতেরই বিশ্বাস আইনে গৃহীত হয়েছে। এরকম কেন হলো? তারা (হিন্দু বিদ্বেষীরা) বিচারপতিদের কটাক্ষ করতে গিয়ে পরোক্ষে আদালতের আদেশকেই অপমান করবার স্পর্ধা পর্যন্ত দেখিয়েছেন, যে বিচারপতিরা ভগবান রাম এবং তাঁর জন্মভূমিকে আদালতের বিচার্য বিষয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরো রায় না পড়ে, আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে কোনও আলোচনা না করে (এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু হলো যে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'বিশ্বাস'কেও আইনের অংশ হিসাবে গণ্য করতে হবে), তথ্য প্রমাণাদি এবং যুক্তি-তর্ককে বিন্দুমাত্র ধর্তব্যের মধ্যে না এনে এই সমস্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গ ভগবান রামচন্দ্র, হিন্দুসমাজ এবং আদালতের রায়ের ওপর তাদের আক্রমণ জারি রেখেছে।

এখানে একটা মূলগত বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী, শরিয়ত আইনের মধ্যেই গণ্য হয়। এখন কী সেই সমস্ত মহাপণ্ডিতম্মন্যগণ ব্যাখ্যা করবেন—কেন শরিয়ত একটি ইসলামিক বিশ্বাস হিসেবে পরিগণিত হবে না? যদি শরিয়তকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অসুবিধে না থাকে তবে এখন হিন্দু বিশ্বাস বনাম আইন নিয়ে এত শোরগোল হচ্ছে কেন? সুতরাং এটাই কি ধরে নেব যে ভারতবর্ষে মুসলিম বিশ্বাসটাই হলো বৃহত্তম আইন এবং হিন্দু বিশ্বাস ছারপোকার মতো এতই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু যাকে ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে যেতে হবে? এই জিনিসটা শুধুমাত্র বিরক্তিকর-ই নয়, মারাত্মকও বটে। অ্যালার্ম বেল (বিপদসঙ্কেত)-ও ইতিমধ্যেই জোরকদমে বাজতে শুরু করে দিয়েছে যখন ওইসব মহাপণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গ মদতপুষ্ট হুল ফুটিয়ে চলেছেন হিন্দু সাধুদের ক্রমাগত নিন্দে-মন্দ করে। একটা স্ববিরোধ কিন্তু থেকেই যায় যখন বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে স্রেফ বিজ্ঞাপনের স্বার্থে সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করে

বিভিন্ন মন্দির ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী দিনভর দেখানো হয়। মানে বিজ্ঞাপন শুল্ক থেকে যখন আয় হচ্ছে তখন হিন্দু বিশ্বাস ঠিক আছে, অথচ দীর্ঘ আইনি যুদ্ধের পর এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত জন্মভূমি ফেরত পেতে চলেছেন তখনই তা বিশ্বাস বনাম আইন, কুসংস্কার ইত্যাদি হয়ে গেল।

শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানরা পথে নেমেছিল এবং ভারতীয় সংসদকে বাধ্য করেছিল সংবিধান সংশোধন করতে। কোনও হিন্দু তার্কিক এপ্রসঙ্গে কোথাও কোনও কিছু উত্থাপন করলে ওই মহাপণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিবর্গ যেন ঘাগরা পরে বসে থাকেন। আর পক্ষপাতদুষ্ট সেইসব অনুষ্ঠানের সঞ্চালকেরা কিংবা বিপক্ষের অধিক শক্তিশালী প্যানেল থেকে লম্বা ইংরেজী বাক্যের তীক্ষ্ণ হ্রাসকারী শব্দবন্ধনীর

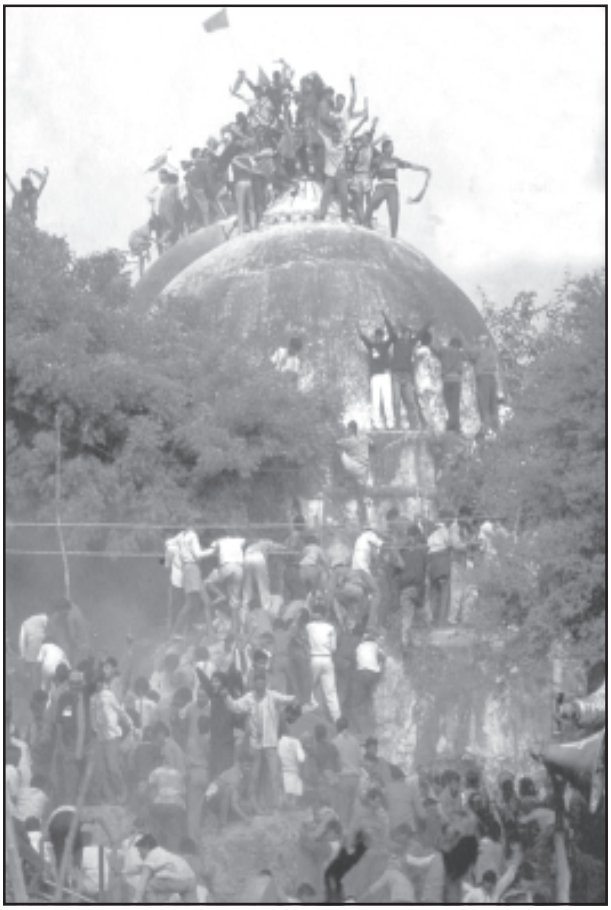

যুগ যুগ সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

দ্বারা সেই হিন্দু-তার্কিকটিকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজগুলো যারা করেন তাদের অধিকাংশ-ই হিন্দু-বিরোধী। ফলে শুধুমাত্র দেখনদারীর জন্য হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যাঁদেরকে বিতর্কে আহ্বান করা হয় তাঁরা বিনাবাক্যব্যয়ে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হন। অধিকাংশ হিন্দুই জানেন এবং অনুধাবন করতে পারেন এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বদমেজাজী লোকজনদেরকে। এই হিন্দুবিরোধী পণ্ডিতম্মন্যদের ন্যক্কারজনক কাজকর্ম হিন্দুরা পরিলক্ষিত করেছেন যখন রামেশ্বরম-এ রামসেতুকে ভেঙ্গে দেবার হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং প্রায় একইসময় কাশ্মীরে অমরনাথ জমির ওপর থাবা বসানো হয়েছিল। আজকে কতিপয় স্তম্ভলেখক 'পণ্ডিত' হওয়া সত্ত্বেও রাম-জন্মভূমি রায় নিয়ে দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়ে চলছেন।

আদালতের তিন বিচারপতি তাঁদের রায়ে উপরোক্ত জমিটিকে সর্বসম্মতিক্রমে ভগবান রামের জন্মস্থান বলে মেনে নেবার পরও এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলছেন। এই অস্বীকার কেবলমাত্র অজ্ঞানতা বা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই নয়;এটা আসলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা পরিকল্পনা মাফিক পদ্ধতিগত খেলা।

দুর্ভাগ্যবশত, এইসব হিন্দু-বিদ্বেষীদের জন্য, ভারতবর্ষের হিন্দুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ইসলামিক ও খৃস্টানী বিশ্বাসকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু হিন্দু-বিশ্বাসকে কুসংস্কার হিসেবে বিবেচনা করে সেটাকে অপমান করা হচ্ছে। এই লোকগুলোই কিন্তু কয়েকটি মসজিদে রাখা কয়েকগাছা চুলের ডি এন এ পরীক্ষার কথা বলেন না কিংবা প্রশ্ন তোলেন, না এক ভদ্রমহিলা কুমারী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারেন! এটা শুনতে খুবই বেদনাদায়ক লাগে যে, কোনও দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মানুষকে 'আবহমানকাল ধরে বলিপ্রদত্ত' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এরাই ফ্রান্সে মুসলিম রমণীদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ করা নিয়ে একপ্রস্থ কান্নাকাটি করল, ইতিপূর্বে সুইজারল্যান্ডে যখন সেদেশের সরকার তাদের অনিন্দ্যসুন্দর হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ওঠা কুৎসিত দর্শন মসজিদের চূড়া (মিনারেট, যেখানে অজান পড়া হয়)-য় মুখ ঢাকছে বলে তা তুলতে নিষেধ করল তখন এরাই গলা ফাটালেন, বহু বছর পূর্বে স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর তাদের আক্রমণের পাল্টা হিসেবে বেখাপ্পা একটা প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছিল এবং এখনও তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বুলি কপচায় তারা।

মুসলিম সমাজের এই অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কোনওকালে মুসলমানদের সমাজে ধর্মের নামে চারটি বিবাহের প্রচলন নিয়ে কিংবা অগণিত-সংখ্যক শিশুর জন্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তাঁরা কখনও প্রশ্ন তোলেননি ভারতীয় অর্থনীতির ওপর দু'জন (মুসলিম স্বামী-স্ত্রী) এতগুলো বোঝা চাপিয়ে দিলে এদেশের অর্থনীতি তা সইবে কি করে এবং এর জন্য আমাদের দেশের উন্নয়নই বা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? পাকিস্তানের সাক্কার ব্যারেজ থেকে আরবস্তানের অনেক মসজিদ রাস্তার মধ্যে অবস্থান করছিল, সেই মসজিদগুলো পরবর্তী সময়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে; কিন্তু কারুর জন্মস্থান কোনওদিনই স্থানান্তরিত হয়নি। স্বাধীনোত্তর ভারতে একটা নোংরা খেলা চলছে যাতে করে বর্তমানে হিন্দু বিশ্বাস এদেশে তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

এইরকম অনবরত এবং অনৈতিক মিথ্যাচারের নোংরা খেলা চলছে হিন্দুদের, হিন্দু মন্দিরগুলো এবং হিন্দু দেব-দেবীদের বিপক্ষে; এখন এটা একটা মারাত্মক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে দেশবাসীর বিচার এবং প্রচলিত আইনকে অস্বীকার করে গণতন্ত্র-বিরোধী একটা

মাত্রায় একে উন্নীত করা হয়েছে। ভারতে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক যাঁরা আক্ষরিক অর্থেই দেশের উন্নতি চান এবং শুধুমাত্র বাগাড়ম্বর করেন না তাঁদের জানা দরকার যে বিশ্বের কোনও গণতান্ত্রিক দেশই এমনকী তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদির মতো দেশও শরিয়তকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তাহলে ভারতে কেন এটি আইন হিসেবে গৃহীত হলো এবং হিন্দু বিশ্বাসকেই বা কেন ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে আবৃত করে ও আইনী কারণ দেখিয়ে দেব-দেবী, মন্দির এবং বিবাহ ইত্যাদিকে অপমান করা হবে? যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আমাদের সবারই গণতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে এসে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং হিন্দু বিশ্বাসের প্রতি এই সম্মান-হানি বন্ধ করতে হবে।

(লেখক একজন প্রথিতযশা ক্যান্সার চিকিৎসক এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক।)

অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে অস্থায়ী রামমন্দির।

অযোধ্যার রামমন্দির : অভিনব ঐতিহাসিক রায়

ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

বৃটিশ ভারতে ভাওয়াল রাজ্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকার মামলার ফয়সালা হয়েছিল ৩৬ বছর পর। মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় তার জমিদারী ফিরে পান ঢাকার জেলা জজ কোর্ট, কলকাতার হাইকোর্ট, শেষে ইংল্যাণ্ডের "প্রিভি কাউন্সিলের" ১৯৩৬-এ ন্যায় বিচারের রায়ে। অযোধ্যার রামমন্দির ভূমির এক তৃতীয়াংশের অধিকার হিন্দুরা ফিরে পেয়েছেন। এখানে যে রামমন্দির ছিল এবং রামমূর্তির পূজাও যে এখানে হ'ত তার স্বীকৃতিও পাওয়া গেছে। ১৯৪৯ সাল থেকে মোকদ্দমার শুরু। মুসলমানরা দাবী করে এখানে যে মসজিদ রয়েছে—তা বাদশা বাবরের তৈরি ১৫২৮ খৃস্টাব্দে। পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে, ১৫২৬ সালে খানুয়ার যুদ্ধে মহাবীর রাজপুত রানা সংগ্রাম সিংহকে কৌশলে পরাভূত করে (১৫২৭) বাবর তাঁর সেনাপতি মীরবাকীকে অযোধ্যায় পাঠান হিন্দুদের সেরা মন্দির 'রামমন্দির' ধবংস করে মসজিদ গড়তে (১৫২৮)। অসহিষ্ণু ইসলামী রীতিতে 'কাফের'দের (বিধর্মী হিন্দু, বৌদ্ধ) ধর্মস্থান ও দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির ধবংসেই 'বেহস্ত' প্রাপ্তি।

হিন্দু ভারতের গৌরবময় গুপ্ত সম্রাটদের আমলে সারা ভারতে নির্মিত হয়েছিল বিখ্যাত হিন্দু মন্দির— গ্রামীণ স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে তা বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির (শিব) ও অযোধ্যায় রামমন্দির ছিল হিন্দুদের বিশেষ ভক্তি, গর্ব ও শ্রদ্ধার।

১০২৫ খৃস্টাব্দে দস্যু মামুদ—সোমনাথ মন্দির ধবংস করে 'সোমনাথ বিগ্রহ' চূর্ণ করে গজনীতে নিয়ে গিয়ে মসজিদের সিঁড়িতে বসায়। যাতে 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমানরা তা মাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন। হিন্দুরা তাকে অনুরোধ করেছিলেন,—সোমনাথ লিঙ্গের (শিবের) সমান ওজনের সোনা দেবেন,—ক্রূর হাসি হেসে মামুদ বলেছিল,—'I am breaker, not seller'—এই 'মহৎ কর্মের' জন্য—খলিফার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সম্মান...উপাধি পান।

রামমন্দির ধবংসকারী হিংস্র মীরবাকীর কাছে হিন্দুরা কাতর ক্রন্দন না করে ত্রিশূল ও তরবারি হাতে বাধা দেন। ১,৭৪০০০ হিন্দুর শিরচ্ছেদ করা হয়। তাদের রক্ত-চূর্ণ বালির সঙ্গে মিশিয়ে মসজিদ গাঁথা হয়।

প্রথমে এগিয়ে আসেন রাজা মেহবৎ সিং, ৭০ দিন যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। আসেন বীর দেবী সিং—তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী জয়রাজ কুমারী এক যোদ্ধাবাহিনী গঠন করেন এবং মন্দির উদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু বাদশাহের সেনা ৩০০০ বীর নারীকে হত্যা করে মন্দির ধবংস করে। আকবর, বীরবল ও টোডরমলের পরামর্শে ভগ্ন মন্দিরের জায়গায় একটি মঞ্চ তৈরি করেন। তার নাম হয়—'রাম চবুতরা'। তার উপর মন্দির তৈরির অনুমতি দেন আকবর। মীরবাকীর তৈরি মসজিদটিকে বলা হয়,—''রাম জন্মস্থান মসজিদ''। রামজন্মস্থান—মঞ্চ (চবুতরা) দখলের জন্য বিশ্বনাথ মন্দির (কাশী) কেশব মন্দির (মধুরা) ধবংসকারী আওরঙ্গজেব সৈন্য প্রেরণ করলে রামদাস শিষ্য বৈষ্ণবদাস তাদের পরাজিত করেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ রাম জন্মস্থান আক্রমণকারী মোগল সৈন্যকে বিধবস্ত করেন। আওরঙ্গজেব বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অযোধ্যায় এসে শতাধিক মন্দির ধবংস করে 'রামজন্মভূমি' দখল করতে কোনওক্রমে সমর্থ হন।

কেন বাবরি মসজিদ নাম

'মীরবাকী'—রামমন্দির ধবংস করে যে সৌধ নির্মাণ করেন—তার নাম বহুদিন পর্যন্ত 'রামজন্মস্থান মসজিদ' ছিল। ইংরাজ শাসকদের কূট কৌশলে 'বাবরি' নামটি মসজিদের পূর্বে বসানো হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়, মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর মসনদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সিপাহীরা বিদ্রোহী হলেও—হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ছিল নিশ্চুপ। হিন্দুদের সমর্থন লাভের জন্য সিপাহীদের শ্রেষ্ঠ নেতা আমীর আলি সিপাহীদের কাছে আবেদন করেন,—''হিন্দু নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরাজ উচ্ছেদের জন্য লড়ছেন—তাই সকল হিন্দুর হৃদয় জয় ও সমর্থন পেতে,—'যেখানে 'বাবরি মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শ্রীরামের সেই জন্মস্থান তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ইংরাজ ভয় পায় যদি এই সূত্রে হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে তাদের আঘাত করে তাহলে ভারত থেকে তাদের বিতাড়িত হতে হবে। তাই প্রচার করে, স্থানটা ''রামের জন্মস্থান নয়''—আর মীরবাকী নির্মিত সৌধটিও রামমন্দির স্থলে তৈরি হয়নি। ওটি বাবরের তৈরি তাই ওটি 'বাবরি মসজিদ'।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের দূত—আমীর আলিকে কৌশলে বন্দী করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় বৃটিশ শাসকরা। কর্ণেল মার্টিন নামে এক সিপাহী, বিদ্রোহ আমলের সৈনিক, সুলতানপুর গেজেটিয়ারে এই কাহিনী লিখে গেছেন।

হিন্দুরা কোনওদিন রাম জন্মস্থানের অধিকার ছাড়েনি। আওরঙ্গজেব বিরাট বাহিনী নিয়ে অযোধ্যা আক্রমণ করলে বাবা বৈষ্ণবদাস দশ হাজার ত্রিশূলধারী সাধু নিয়ে বাধা দেন। নবাব ওয়াজেদ আলি কিন্তু কতকটা নিরপেক্ষ ছিলেন। রামমন্দিরে হিন্দুদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সমর্থনে সৈন্য পাঠান। ইংরাজরা আমীর আলিকে ফাঁসি দিয়ে 'বাবরি মসজিদ' যে মুসলমানদের তা প্রচার করে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাধা দেয়। তার ফলে মোকদ্দমার সূত্রপাত। 'বাবরি মসজিদ' 'রাম জন্মভূমি' বিতর্কে ওয়ালি মহম্মদ নামে এক মুসলমান নেতা ১৮ জন নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ফৈজাবাদের (অযোধ্যা) উচ্চ আদালতে এক হলফনামা পেশ করেন। তাতে তাঁরা জানান,—''আমরা আল্লার নামে শপথ করে ঘোষণা করছি—'বাবরি মসজিদ' প্রকৃতই 'রাম জন্মভূমি মন্দির'। বাদশা বাবর এই মন্দির ধবংস করে মসজিদ তৈরি করেন। হিন্দুরা কখনই সেখান থেকে তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার হারায়নি। বাবরের কাল থেকে অদ্যাবধি ৭৬ বার মন্দির দখল নিয়ে দাঙ্গা ও যুদ্ধ হয়েছে।...মন্দিরের স্থান হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে আমরা আদালতকে অনুরোধ করছি।''

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রকাশ পায়,—''চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, রামজন্মভূমি মন্দির মূল্যবান প্রস্তরে নির্মাণ করেন। ৮৪টি সুউচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। তাতে লক্ষ্মী, গণেশ, শঙ্কর, হনুমান প্রভৃতির বিভিন্ন মূর্তি এবং পদ্মফুল ও বিভিন্ন নক্শা খোদাই করা আছে। এরই ভগ্নাংশের উপর বাবর সেনাপতি মীরবাকী মসজিদ নির্মাণ করে (১৫২৮)। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৮৬ সালে মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। রামলালার পূজা একদিনও বন্ধ হয়নি।

১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর অযোধ্যা শহরে রামমন্দিরের শিলান্যাস হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ঐতিহাসিক ডঃ জয় দুবাসী বলেন—"For the first time in several centuries, the history of India is being made by Indians call them 'Hindu."

সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। কিন্তু এরা কোন প্রামাণ্য তথ্য সমৃদ্ধ দলিল বা পুঁথি বাবরি মসজিদের সমর্থনে পেশ করতে পারেনি। বরং বিচারকদের কাছে 'রামমন্দির' দাবীদাররা, মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দেন,—হিংস্র লুটেরা দস্যু-তুর্কী-আফগান-পাঠান-মোগলদের অস্ত্রাঘাতে বহু সহস্র হিন্দু-বৌদ্ধ-মঠ-মন্দির বিহারের ধবংস ঘটেছে। এই তালিকায় রয়েছে—নালন্দা, বিক্রমশিলা বিহার, (১২০৪), সোমনাথ মন্দির (১০২৫), কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির (১৬৬৯), মথুরার বিষ্ণুমন্দির (১৬৭০), কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী মন্দির (১৬৭৫)— স্বামী বিবেকানন্দ এই ভগ্ন ভবানী মন্দির দেখে বিচলিত হয়েছিলেন (১৮৯৮)। অথচ হিন্দুরা একটিও মসজিদ ধবংস করেনি। মহাবীর শিবাজীকে—মুসলমান ঐতিহাসিকরা জঘন্য ভাষায় কটূক্তি করলেও

শিবাজী কোনও মসজিদ ধবংস করেননি। বরং মসজিদ সংস্কারে অর্থদান করতেন। মন্দির বিতর্কে, অযোধ্যার তথাকথিত বাবরি মসজিদ যে রামমন্দিরের স্থলেই নির্মিত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ৯ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে রামমন্দিরের শিলান্যাস আরম্ভ হয়। বিচিত্র ব্যাপার, শিলান্যাসের ব্যাপারে সারা ভারতের হিন্দু ভক্তদল শুধু নয়, সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও এগিয়ে আসেন।

গুজরাট থেকে আগত একদল করসেবক যখন দেশে ফিরছিলেন তখন ট্রেনের কামরা বন্ধ করে পেট্রোল ঢেলে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়। করসেবকরা ছিলেন ৫৮ জন। দুষ্কৃতকারীরা ছিল রেলের কর্মী-মুসলমান। তারা ধরা পড়ে, জেল হয়। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হয় ভয়ানক। গোধরার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিরীহ শান্ত হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়। দাঙ্গা শুরু হয়। 'রাম জন্মভূমি'—বাবরি মসজিদ বিতর্ক

রামজন্মভূমি এলাকা খননের পর প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

মামলাটি ওঠে এলাহাবাদ হাইকোর্টে। লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে র তিন সুবিজ্ঞ সুবিদ্বান বিচারপতি রাম জন্মভূমির সঠিক অবস্থান ও রামমন্দিরের অস্তিত্ব ব্যাপারে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার (এ এস আই) দ্বারস্থ হন। এ এস আই-এর রিপোর্ট দেখে বিচারকগণ নিশ্চিত হন বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির ছিল। কারণ বিচূর্ণ সৌধের নিচে—মাটির তলায় হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। Radio-Carbon পরীক্ষায় ধরা পড়ে—এগুলি অন্ততঃ হাজার বছরের প্রাচীন, মন্দির মেঝের আমলকা বা চক্র, দেবীগঙ্গ ার বাহন মকরের ভাস্কর্য, ভগ্নস্তম্ভের গাত্রের বল্লারি অর্থাৎ ফুলের কারুকাজ, জল বার করার পয়ঃপ্রণালী হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব স্মরণ করায়। এ এস আই এর অধিকর্তা এস পি গুপ্তা—তথাকথিত বাবরি মসজিদের নিচে যে রামমন্দির ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন।

৩০ সেপ্টেম্বর (২০১০) লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে র সুবিজ্ঞ বিচারকগণ দীর্ঘ ১৮ বছরের মামলার রায়ে—অযোধ্যার জমিতে রামমন্দির ছিল বলে রায় দেন। ৬০ বছর পূর্বে যে মামলার শুরু তার মীমাংসা হয় ২০১০ খৃষ্টাব্দে। শ্রীরাম ফিরে পান তাঁর স্বভূমির অধিকার।

তথ্যসূত্র ঃ

১. জোসেফ স্টিকেন্দ্র হেলার অস্টিক পর্যটকের বিবরণী—(১৭৭৫)।

২. মির্জা রজব আলি বেগ—ফান্সানাই ইব্রত

৩. মহম্মদ আসগর—মসজিদের জন্মস্থান

৪. মির্জা জান—হাদিকা-ই-শুহাদা

৫. শেখ আজামত আলি—তারিখ-ই-আওয়াধ

৬. গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গুমনমল লোধার গ্রন্থ।

৭. শিবাজী—যদুনাথ সরকার।

অযোধ্যার রায় ও তার প্রতিক্রিয়া

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সকলেই জানেন যে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট অযোধ্যা-মামলার রায় দিয়েছে। ২ ঃ ১ গরিষ্ঠতায় আদালত যে মীমাংসা সূত্র দিয়েছে, তার মর্মার্থ হলো—

১. অযোধ্যার সেই জমিকে (২.৭৭ একর) তিন ভাগে ভাগ করা হবে;

২. 'রামলালা' ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি যেখানে আছে, সেটা মন্দির হিসেবেই থাকবে;

৩. বাইরের চত্বরের 'রাম চবুতরা', 'সীতা রসোই', এবং 'ভাণ্ডার' থাকবে নির্মোহী আখড়ার হাতে; এবং

৪. আর এক-তৃতীয়াংশ পাবে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

এই রায় আইনের দিক থেকে কতটা যথার্থ, সেটা বলতে পারবেন আইনজ্ঞরা। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে, এতে একটা সমন্বয়ধর্মী প্রয়াস রয়েছে। রাম রহিমের সহাবস্থান ঘটিয়ে সম্ভবত বিচারপতিরা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছেন।

অবশ্য যাতে এই রায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও পক্ষ উচ্চতম আদালতে যেতে পারেন, তার সুযোগও রাখা হয়েছে—বলা হয়েছে, আপীল করতে হবে তিন মাসের মধ্যে। বলা বাহুল্য, এই রায় সুন্নী ওয়াকফ বোর্ডকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি—সুতরাং ওই সংস্থা সুপ্রীম কোর্টে যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে—আপীল করবে হিন্দু মহাসভাও।

এই কারণে বলা যায়—ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ব্যয়িত হবে আরও অনেক সময়। সেই সুযোগে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

১৯৯২ সালে এই বিতর্কিত সৌধের খানিকটা ভেঙে দিয়েছিলেন রাম-ভক্তরা। তাঁদের দাবি ছিল—সেটা আসলে ছিল রামমন্দির—বাদশাহ্ বাবরের সময় তাঁর অধীনস্থ মীরবাকী সেটার ঊর্ধাংশ ভেঙে মসজিদের রূপ দেয়। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে কোটি কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধা ভক্তি জড়িত, সেই কারণেই সেটাকে আবার হিন্দু-মন্দিরে রূপায়িত করা উচিত বলে তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন।

এটা লক্ষণীয় যে, সেই দাবির অনেকটাই এই রায়ে স্বীকৃত হয়েছে। আমরা আগেই বহু গুণীজন ও সাংবাদিকের লেখার সূত্রে জেনেছি যে, ওই সৌধের নিচের অংশে রামচন্দ্র, হনুমান প্রমুখ দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। রামচন্দ্র অবশ্যই দেব-অবতার হিসেবে পূজিত হন—তিনি ইতিহাস-পুরুষ নন। সুতরাং তাঁর জন্মস্থান হিসেবে অযোধ্যা উল্লেখ থাকলেও সেটা ঠিক স্থানটা এটা নির্ণয় করে লাভ

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের তিন বিচারপতি

সুধীর আগরওয়াল *এস ইউ খান* *ধরমবীর শর্মা*

নেই। কিন্তু মন্দির যখন সেখানে ছিলই, সেটা তাঁর নামে হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে'ও মসজিদের নিচে মন্দিরের কাঠামো খুঁজে পেয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিরা সেটাকে মন্দির হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

আর ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু যে মন্তব্য করেছেন, ১৮৫৫ সালের আগেই এখানে 'রাম-চবুতরা' 'সীতা-রসোইঘর' ছিল এবং হিন্দুরা অত্যন্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে রামসীতার অর্চনা করতেন। 'দেশের মানুষ প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান', সকালবেলা। (২৯.১০.১০)। অবশ্য বাবর যেটা ভেঙেছেন যার তিনি কোনও প্রমাণ পাননি। শিখ গুরুনানক ও কবি তুলসীদাস সমকালীন ব্যক্তি হয়েও মন্দির ভাঙার কোনও উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে, এতেই ধরে নেওয়া যায় যে, বাবর লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালালেও রামমন্দির ভেঙেছেন—এর প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর।

মামলায় বিচারপতি সিবাগতউল্লা খান অবশ্য মন্তব্য করেছেন—বাবর সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছিলেন—একথা প্রমাণ করা কঠিন। জমিটি বাবরের হেফাজতে ছিল—এটাও প্রমাণিত তথ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, মন্দিরের ধবংসাবশেষের ওপরেই মসজিদটা গড়ে উঠেছে। এমনকি, মসজিদের নির্মাণে মন্দিরের ধবংসাবশেষকেও কাজে লাগানো হয়েছে। বিচারপতি আগরওয়ালও মন্দিরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে বিচারপতি ধরমবীর শর্মা মনে করেন, বিতর্কিত অংশেই রামচন্দ্রের জন্মস্থান এবং বাবরের উদ্যোগেই বিতর্কিত কাঠামোটা তৈরি হয়েছিল। সুতরাং এটাকে কিছুতেই মসজিদ বলা যায় না।

সেদিক থেকে বলা যায়—এটা আদপে মসজিদ ছিলই না। আদালতের মতে, মন্দিরটা অবশ্য কালের অমোঘ নিয়মে ধবংস হয়েছিল। নাকি ধবংস করা হয়েছিল—সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হলো—তার ওপরেই তৈরি করা হয়েছিল এই মসজিদ।

আর আমাদের মনে হয়—যেহেতু এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বাবরি' মসজিদ—তাহলে বাবরের নির্দেশে বা তাঁর আমলে এই কীর্তিটা করা হয়েছে।

এবার একটু ইতিহাসের কথা বলি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্‌লামিক ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী লিখেছেন 'বাবর অযোধ্যা-বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার মন্দির ধবংস এবং উহার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন'—(ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। এত বড় ঐতিহাসিক নিশ্চয় তথ্য প্রমাণ ছাড়া এমন কথা লিখতে পারেন না।

আসলে, হিন্দু বিদ্বেষ বা মন্দির ধবংসের ঐতিহ্য ইসলামী শাসনে অদ্ভুত কিছু ছিল না। ডঃ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, আলাউদ্দিনের মধ্যেও প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষ ছিল। তবে মন্দির ধবংসের ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে বেড়েছে পরবর্তীকালে। অশীন দাশগুপ্তর মতে, তুর্কী-বেশে ইস্‌লাম হিন্দু মন্দির ও পুরোহিতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তখনই শুরু হয়েছিল ধর্মান্ধতার যুগ—(বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়, পৃ. ১৪৬)। বলা বাহুল্য—শেরশাহ্ ও আকবরের কথা বাদ দিলে মুসলিম যুগটাই ছিল হিন্দু বিদ্বেষ ও মন্দির ধবংসের যুগ। ডঃ নিশীথরঞ্জন রায় লিখেছেন—'Both Jahangir and Shah Jahan often committed acts of religious intolerance. This policy of intolerance was followed with even greater zeal by Aurangzeeb with disastrous consequences...He wanted to convert India into full fladged Islamic state...He caused a number of Hindu temples to be destroyed and mosques to be raised on their ruins'—(এ শর্ট হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৪৪)।

অবশ্য গবেষক সতীশচন্দ্র তাঁর 'মুঘল রিলিজিয়াস পলিসি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ঔরঙ্গজেব প্রথম দিকে ততটা ধর্মান্ধ ছিলেন না। কিন্তু রাজপুত ও মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষ, আফগান দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ফলে তাঁর মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমে তিনি ধর্মান্ধ ও মন্দির ধবংসকারী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, যদুনাথ সরকারের মতে, ঔরঙ্গজেব চিরদিনই ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী, আর এই নীতি তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন (দ্রষ্টব্য, 'রেইন অফ ঔরঙ্গজেব')। তিনি কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ধবংস করেছিলেন, কারণ তার গর্ভগৃহে এক নারীর শ্লীলতাহানি ঘটেছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হওয়ার কথা—মন্দির ভাঙাটা তার প্রতিক্রিয়া হতেই পারে না।

এটা তার আগের সুলতানী যুগেও ঘটেছে। তুর্কী বিজয়ের প্রথম দিকে বেশ কিছু মন্দির ধবংস করা হয়েছিল। দিল্লির বিষ্ণু মন্দির (মতান্তরে জৈন মন্দির) ভেঙে কুতুবমিনারের কাছে 'কুওয়াৎ-উল-ইস্‌লাম' মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। ডঃ মুজিবের মতে, সেই সময় শাসকদের তত্ত্ব ছিল—পৌত্তলিকদের হত্যা বা দাস করা ধর্মীয় কর্তব্য—(গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৬২)।

মুঘল যুগের জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের কথা আগে বলেছি। জ্বালামুখী মন্দিরে জাহাঙ্গীরের আচরণই তার চরিত্রকে চিনিয়ে দিয়েছে। শাহজাহান ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন বারবার। তাঁর আদেশে বারাণসীতে ৭৬টা মন্দির ভাঙা হয়েছিল—(লাহোরী-বাদশাহী কাল-৪৪৯)।

একটা কথা বলা দরকার। সুলতান মামুদ আঠারো বার সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করে বিপুল সম্পদ নিয়ে গেছেন, কিন্তু মন্দির ধবংস করেননি অর্থের লোভে। মুঘল-যুগের শেষ দিকে নাদির শাহ্ লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালিয়েছেন, শত শত মন্দির ধবংস করেছেন, দেবদেবীর মূর্তি দিল্লির পথে-পথে স্তূপীকৃত করা হয়েছে যাতে মানুষের পায়ের চাপে সেগুলো ধবংস হয়। আহ্‌মেদ শাহ আবদালী মথুরা ও বৃন্দাবনও ধবংস করেছেন। ডঃ তারাচাঁদ লিখেছেন, 'There was no atrocity which was not perpetrated'—(হিস্ট্রি অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য ডঃ আর. পি.

ত্রিপাঠী জানিয়েছেন যে, বাবরের অজ্ঞাতে কোন মন্দির ভাঙা হয়ে থাকতে পারে—(রাইস্ এ্যান্ড ফল্ অফ মুঘল এম্পায়ার, পৃ. ২৯২) । কিন্তু 'বাবরি' নামটা থেকেই তাঁর দায়টা এসে পড়ে।

এমনকি, ছোটখাটো নবাব-সুলতানের রাজ্যেও এই ধর্মান্ধতা চলেছে। বিজয়নগরের এক যুবরানী গঙ্গাদেবী চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 'মথুরাবিজয়ম্' কাব্যে শাক্তদের মন্দির ভাঙা ও হিন্দুধর্মগ্রন্থ জ্বালিয়ে দেওয়ার উল্লেখ করেছেন—(সীতারাম গোয়েল - সেকুলারিজম্, অনুবাদ সুহাস মজুমদার, পৃ. ২৯)। এই ধরনের উদাহরণ আরও আছে।

কিন্তু এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে ইতিহাসের কিছু তথ্যকে তুলে ধরা—সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতকে খুঁচিয়ে বিষাক্ত করা নয়। আসল কথা—অতীত ঘেঁটে লাভ নেই। সৃষ্টি করতে হবে এক সুখী, সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে। সেক্ষেত্রে দরকার সহনশীলতা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা। ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দু-মানসিকতা প্রথম থেকেই বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সাধনা করেছে। আক্রমণকারীর বেশে যারা এসেছে, তাদের সঙ্গেও ভারতবাসী অনেকটা মিশে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'শক্-হূণদল, পাঠান-মোঘল এক দেহে হলো লীন।' সেই ধারা থেকে তিনি ভারততীর্থের বন্দনা গেয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টের ভাষায়ও হিন্দুধর্ম শুধু একটা ধর্মমত নয়, এটা হল 'a way of life'। সেই ঐতিহ্য হল সমন্বয় ও মিলনের। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হিন্দু-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—তখন থেকেই শুরু হয়েছে সেই ঐক্যের সাধনা (আচার্য যদুনাথ সরকার—ইউনিটি অফ ইন্ডিয়া', দ্য মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯৪২)। মজুমদার, রায়চৌধুরী-দত্তের 'অ্যান্ অ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আছে—জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাচীন যুগে ভারতে ছিল 'a underlying unity'–(পৃ. ৬-৭)। তাঁদের বক্তব্য–'This unity was matured in the nineteenth century¼'

অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে আক্রমণকারী জঙ্গিদের নিহত একজন পড়ে রয়েছে (৫.৭.২০০৫)।

সেই ধারাকেই বজায় রাখতে হবে। অবশ্য কোন কোন মুসলমান লেখক ও 'প্রগতিশীল' হিন্দু প্রাবন্ধিক অতি উৎসাহে জানিয়েছেন যে, হিন্দু যুগে বৌদ্ধদের সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে। সেটা হয়ত হয়েছে, কিন্তু বৌদ্ধ-স্তুপ ভেঙে মন্দির করা হয়েছে—এমনটা শুনিনি। বুদ্ধ দেব ও জৈন-তীর্থঙ্করদেরও হিন্দুধর্ম অবতার বলে গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে এসেছে সমন্বয়-প্রয়াস। পরবর্তীকালে অবশ্য হিন্দুধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছে—বৌদ্ধ -যুগ শেষ হয়েছে নিজেদের বিভেদ, তান্ত্রিকতা ও রাজানুগ্রহের অভাবে। ঐতিহাসিক এইচ জি ওয়েলস্ মন্তব্য করেছেন—'For long centuries, Buddhism

and Brahminism flourished side by side and, then, Buddhism decayed and Brahminism, in a multitude of forms, replaced it'—(এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃ. ১০৬) । তাছাড়া হিন্দুধর্মের মধ্যেই তো রয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম, তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, আউল ব্রহ্মা ও মাতৃসাধকের আশ্চর্য সমাবেশ। আরও বড় কথা—আর্য সভ্যতা কিন্তু অনার্য যুগ থেকে নিয়েছে অনেক কিছু। ইতিহাস তার বহু সাক্ষ্য বহন করেছে। কেবল গুপ্ত যুগের রাজারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁরা দেখিয়েছেন ধর্ম-সহিষ্ণুতা, তেমনি পাল-রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও অন্য ধর্মের প্রতিও দেখিয়েছেন শ্রদ্ধাভক্তি।

এই মিলনের সাধনাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ধর্ম—(ডঃ রামচরণ শর্মা—এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, অনুঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২)। এটাই ভারতের ঐতিহ্য।

সেই ধারার একটা শুভ প্রকাশ দেখেছি পূর্বোক্ত রায় প্রকাশিত হওয়ার পর। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও নির্মোহী আখড়া সমঝোতা করেছে যৌথভাবে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রামমন্দির তৈরির জন্য। আর অন্যতম মামলাকারী মহম্মদ হাসিম আনসারী ওকথা বলেছেন মহন্ত জ্ঞানদাসের সঙ্গে। যদি পূর্বোক্ত পক্ষের অনুরোধে সুন্নী বোর্ড এক-তৃতীয়াংশ জমি একটু দূরে পায় এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য পায় হিন্দু-পক্ষের কাছ থেকে, তাহলে এই ব্যাপারে একটা স্থায়ী ও সুন্দর মীমাংসা হতে পারে। যেহেতু অযোধ্যা-মন্দিরের সঙ্গে দেশের কোটি কোটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাবাবেগ জড়িত আছে, সুন্নী-বোর্ডের উচিত এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া—তাতে কিন্তু ঐক্যের পথ সুগম হবে।

এমন প্রস্তাব ১৯৯২ সালের ওই ঘটনার আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দিয়েছিল। কিন্তু সেটা মৌলবাদী মুসলমান-সমাজ মেনে নেয়নি—বরং ইমাম পাক্-দূতাবাসে গেছেন। এই সব কারণেই ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন—'The vested interests among the Indian Muslimes are guided by medievalism'—(ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৪০১)।

সুতরাং সুন্নি-বোর্ড সুপ্রীম কোর্টে গেছে। মহম্মদ হাসিমকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। মুলায়ম সিং, লালুপ্রসাদেরা, মুসলিম মানসকে জিইয়ে রাখতে চায়—তারা ওই রায়ে সন্তুষ্ট নয়। আর সি পি আই (এম) তো চিরদিনই ঘোলা জলে মাছ ধরে। এই দলের বক্তব্য—পূর্বোক্ত রায়ে হিন্দু বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আর সৌধটা যে মন্দির ছিল—সেটা প্রমাণিত হয়নি। মনে পড়ছে ১৯৪৭ সালে বিধানচন্দ্র রায় বৌবাজার কেন্দ্রে মহম্মদ ইস্‌মাইলের চেয়ে ৫৪০ ভোট বেশি পেয়ে জিতেছিলেন। জ্যোতি বসু বলেছিলেন—মুখ্যমন্ত্রী বুঝেছেন যে, তিনি তেমন মুসলিম ভোট পাননি। যাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যেন মুসলমানদের ওপর অত্যাচার না করেন। এই দেশে তো তাঁরা মরেই রয়েছেন।

এর ফলে কলকাতা হাইকোর্টের ১১০ জন আইনজীবী একটা বড় পত্রিকায় খোলা চিঠি লিখে তাঁকে পাকিস্তানে গিয়ে রাজনীতি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই সব নেতার হাত থেকে মুক্তি না পেলে দেশের রাজনীতি কখনও শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হতে পারে না। এরা জানে না—সৌদি আরবে রাস্তা চওড়া করার জন্য বহু মসজিদ ভাঙা হয়েছে। কিন্তু শুধু দক্ষিণ-কলকাতার কথাই বলি—আনোয়ার শা' রোডে একটা মসজিদকে রক্ষা করার জন্য রাস্তাকে দু-ভাগ করা হয়েছে, সেই রাস্তা টালিগঞ্জের ট্রাম-লাইনে মিশেছে—সেখানেও মসজিদের জন্য রাস্তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু কাছাকাছি শিবমন্দিরকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সেক্ষেত্রে কিন্তু 'গেল-গেল' রব ওঠেনি।

১৯৯২ সালে অযোধ্যা-ঘটনার পর জ্যোতি বসু বলেছিলেন—'বিজেপি অসভ্যের দল—ওরা মসজিদ ভাঙে।' কিন্তু মসজিদ ভাঙা হল কোথায়? বরং কাশ্মীরে তখন সব মন্দির ভাঙা হয়েছে। বাংলাদেশে সব মন্দির ভেঙে দেওয়ার ফলে হিন্দুরা ঘট পুজো করেছিলো।

এভাবেই রাজনীতির ক্লিষ্টতা ধর্মীয় জীবনকে কলুষিত করে চলেছে।

Swastika RNI No. 5257/57
8 November - 2010, **Dipavali Spl.**
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

सूर्या लाया है GE टैक्नोलोजी द्वारा विश्व का सबसे बढ़िया CFL लैम्प

World's best CFL made in India only by SURYA

PRAKASH SURYA
STEEL TUBES & PIPES

FARM OR HOME
PRAKASH SURYA PIPES LASTS
FOR YEARS & YEARS

SURYA ROSHNI LIMITED

দাম ঃ ৬.০০ টাকা